রিক্তের বেদন

নজরুল ইস্‌লাম



ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট,
কলিকাতা—৬



দুই টাকা মাত্র

শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্ত্তৃক ডি, এম, লাইব্রেরী ৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬ হইতে প্রকাশিত ও বাণী-শ্রী প্রেস ৮৩-বি বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা ৬ শ্রীসুকুমার চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

রিক্তের বেদন

(ক)

—বীরভূম।—

আঃ! একি অভাবনীয় নতুন দৃশ্য দেখ্‌লুম আজ?

জননী জন্মভূমির মঙ্গলের জন্যে সে-কোন্-অদেখা দেশের আগুনে প্রাণ আহুতি দিতে একি অগাধ-অসীম উৎসাহ নিয়ে ছুটেছে তরুণ বাঙালীরা,—আমার ভাইরা! খাকি পোষাকের ম্লান আবরণে এ কোন্ আগুনভরা প্রাণ ছাপা রয়েছে!—তাদের গলায় লাখো হাজার ফুলের মালা দোল্ খাচ্ছে, ও গুলো আমাদের মায়ের-দেওয়া ভাবী-বিজয়ের আশীষমাল্য,—বোনের-দেওয়া স্নেহ-বিজড়িত অশ্রুর গৌরবোজ্জ্বল-কমহার!

ফুলগুলো কত আর্দ্র-সমুজ্জ্বল! কি বেদনা-রাঙা মধুর! ও গুলোত ফুল নয়, ও যে আমাদের মা-ভাই-বোনের হৃদয়ের পূততম প্রদেশ হ'তে উজাড়-ক'রে দেওয়া অশ্রুবিন্দু! এই যে অশ্রু ঝরেছে আমাদের নয়ন গলে, এর মত শ্রেষ্ঠ অশ্রু আর ঝরেনি,—ওঃ সে কত যুগ হ'তে!

আজ ক্ষান্ত-বর্ষণ প্রভাতের অরুণ কিরণ চিরে নিমেষের জন্য বৃষ্টি নেমে তাদের খাকি বসনগুলোকে আরো গাঢ়-ম্লান করে দিয়েছিল! বৃষ্টির ঐ খুব মোটা মোটা ফোঁটাগুলো বোধ হয় আর কারুর ঝরা অশ্রু!

সেগুলো মায়ের অশ্রু-ভরা-শান্ত আশীর্ব্বাদের মত তাদিগে কেমন অভিষিক্ত করে' দিলে!

তারা চলে' গেল! একটা যুগবাঞ্ছিত গৌরবের স্বার্থকতার রুদ্ধবক্ষঃ-বাষ্পরথের বাষ্পরুদ্ধ ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ ছাপিয়ে আশার সে কি করুণ গান দুলে' দুলে' ভেসে আস্‌ছিল,—

"বহুদিন পরে হইব আবার আপন কুটীরবাসী,
হেরিব বিরহ-বিধুর-অধরে মিলন-মধুর হাসি,
শুনিব বিরহ-নীরব কণ্ঠে মিলন-মুখর বাণী,—
আমার কুটীর-রাণী সে যে গো আমার হৃদয়-রাণী।

সমস্ত প্রকৃতি তখন একটা বুকভরা স্নিগ্ধতায় ভরে' উঠেছিল। বাঙ্‌লার আকাশে, বাঙ্‌লার বাতাসে সে বিদায়-ক্ষণে ত্যাগের ভাস্বর অরুণিমা মূর্ত্ত হয়ে ফুটে' উঠেছিল! কে বলে মাটির মায়ের প্রাণ নেই?

এই যে জল-ছলছল শ্যামোজ্জ্বল বিদায় ক্ষণটুকু অতীত হ'য়ে গেল, কে জানে সে আবার কত যুগ বাদে এম্‌নি একটা সত্যিকার বিদায় মুহূর্ত্ত হয়ে আসবে?

আমরা 'ইস্তকনাগাদ্' ত্যাগের মহিমা কীর্ত্তন পঞ্চমুখে করে' আস্‌ছি, কিন্তু কাজে কতটুকু কর্‌তে পেরেছি? আমাদের করার সমস্ত শক্তি বোধ হয় এই বলার মধ্য দিয়েই গলে যায়!

পার্‌বে? বাঙ্‌লার সাহসী যুবক! পার্‌বে এম্‌নি করে' তোমাদের সবুজ, কাঁচা, তরুণ জীবণগুলি জলন্ত আগুনে আহুতি দিতে দেশের এতটুকু সুনামের জন্যে? তবে এস! 'এস নবীন, এস! এস কাঁচা, এস!' তোমরাই ত আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ আশা, ভরসা সব! বৃদ্ধদের মানা শুনোনা। তাঁরা মঞ্চে দাঁড়িয়ে সুনাম কিনবার জন্য

ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে তোমাদের উদ্বুদ্ধ করেন, আবার কোন মুগ্ধ যুবক নিজেকে ঐ রকম বলিদান দিতে আসলে আড়ালে গিয়ে হাসেন এবং পরোক্ষে অভিসম্পাৎ করেন! মনে করেন, 'এই মাথা গরম ছোকরাগুলো কি নির্ব্বোধ!' ভেঙে ফেল, ভেঙ্গে ফেল ভাই, এদের এ সঙ্কীর্ণ স্বার্থ-বন্ধন!

অনেকদিন পরে দেশে একটা প্রতিধ্বনি উঠ্‌ছে "জাগো হিন্দুস্থান জাগো! হুশিয়ার!"

নান্নর।—

মা! মা! কেন বাধা দিচ্ছ? কেন এ অবশ্যম্ভাবী একটা অগ্ন্যুৎপাতকে পাথর চাপা দিয়ে আট্‌কাবার বৃথা চেষ্টা কর্‌ছ?—আচ্ছা মা! তুমি বি-এ পাশকরা ছেলের জননী হ'তে চাও, না বীর-মাতা হ'তে চাও? নিঝুমঘুমের-আলস্যের দেশে বীরমাতা হবার মত সৌভাগ্যবতী জননী কয়জন আছেন মা!? তবে, কোন্‌টা বরণীয় তা' জেনেও কেন এ অন্ধস্নেহকে প্রশ্রয় দিচ্ছ? গরীয়সী মহিমান্বিতা মা আমার! ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও—তোমার এ জনম-পাগল ছেলেকে ছেড়ে দাও! দুনিয়ার সব কিছু দিয়েও এখন আমায় ধ'রে রাখ্‌তে পারবে না। আগুন আমার ভাই—আমায় ডাক দিয়েছে। সে যে কিছুতেই আঁচলচাপা থাক্‌বে না। আর, যে থাক্‌বে না, সে বাঁধন ছিঁড়্‌বেই। সে সত্যসত্যই পাগল, তার জন্যে এখনও এমন পাগ্‌লা গারদের নির্ম্মাণ হয়নি, যা' তাকে আট্‌কে রাখ্‌তে পারবে!

পাগল আজকে ভাঙ্‌রে আগল
পাগ্‌লা গারদের,

আর ও'দের

সকল শিকল শিথিল করে বেরিয়ে পালা বাইরে
দুশ্‌মন্‌ স্বজনের মত দিন দুনিয়ায় নাইরে !
ও তুই বেরিয়ে পালা বাইরে ॥

* * * *

আজ যুদ্ধে যাবার আদেশ পেয়েছি ! পাখী যখন শিকলি কাটে তখন তার আনন্দটা কি রকম বেদনা-বিজড়িত মধুর ।

আহ্‌, আমায় আদেশ দিয়ে শেষ আশীষ করবার সময় মা'র— গলার আওয়াজটা কি রকম আর্দ্র-গভীর হয়ে গিয়েছিল ! সে কি উচ্ছ্বসিত রোদনের বেগ আমাদের দুজনকেই মুস্‌ড়ে দিচ্ছিল !··· হাজার হোক্‌, মায়ের মন ত ।

আকাশ যখন তার সঞ্চিত সমস্ত জমাট-নীর নিঃশেষে ঝরিয়ে দেয়, তখন তার অসীম নিস্তব্ধ বুকে সে কি একটা শান্ত সজল স্নিগ্ধতার তরল কারুণ্য ফুটে' উঠে !

মা'র একমাত্র জীবিত সন্তান বি-এ পড়্‌ছিলুম ; মায়ের মনে যে কত আশাই না মুকুলিত পল্লবিত হ'য়ে উঠেছিল ! আমি আজ সে সব কত নিষ্ঠুরভাবে দ'লে দিলুম ! কি করি, এ দিনে এ রকম যে না ক'রেই পারি না ।

আমার পরিচিত সমস্ত লোক মিলে আমায় তিরস্কার কর্‌তে আরম্ভ করেছে যেন আমি একটা ভয়ানক অন্যায় করেছি । সবাই বল্‌ছে, আমার সহায়সম্বলহীন মা'কে দেখ্‌বে কে !····হায়, আজ আমার মা যে রাজরাজেশ্বরীর আসনে প্রতিষ্ঠিতা, তা কাউকে বুঝতে পার্‌ব না !

কাকে বুঝাই যে, লক্ষপতি হয়ে দশ হাজার টাকা বিলিয়ে দিলে

তাকে ত্যাগ বলে না, সে হচ্ছে দান। যে নিজেকে সম্পূর্ণ রিক্ত করে' নিজের সর্ব্বস্বকে বিলিয়ে দিতে না পার্‌ল, সে ত ত্যাগী নয়। মা'র এই উঁচু ত্যাগের গগনস্পর্শী চূড়া কেউ যে ছুঁতেই পার্‌বে না। তাঁর এ গোপন বরেণ্য ত্যাগের মহিমা একা অন্তর্য্যামীই জানেন!

এই ত সেই সত্যিকারের মোস্‌লেম জননী, যিনি নিজ হাতে নিজের একমাত্র সন্তানকে যুদ্ধসাজে সাজিয়ে জন্মভূমির পায়ে রক্ত ঢালতে পাঠাতেন।

এ বিসর্জ্জন না অর্জ্জন?

সালার ॥—

জননী আর জন্মভূমির দিকে কখনও আর এত স্নেহ এত ব্যথিত দৃষ্টিতে চেয়ে দেখিনি, যেমন তাঁদিগে ছেড়ে' আস্‌বার দিনে দেখেছিলুম। শেষ চাওয়া মাত্রেই বোধ হয় এম্‌নি প্রগাঢ় করুণ।

নাঃ, আমাকে হয়রান্ করে ফেল্‌লে এদের অতি ভক্তির চোটে! আমি যেন মহা-মহিমান্বিত এক সম্মানার্হ ব্যক্তিবিশেষ আর কি! দিন নেই, রাত নেই, লোক আস্‌ছে আর আস্‌ছে। যে-আমাকে তারা এইখানেই হাজার বার দেখেছে তারাও আবার আমাকে নতুন করে দেখ্‌ছে। এ এক যেন তাজ্জব ব্যাপার। আমি আমার চির পরিচিত শৈশবসাথী বন্ধুদের মাঝে থেকেও মনে কর্‌ছি যেন 'আবু হোসেনে'র মত এক রাত্তিরেই আমি ঐ রকম একটা রাজা-বাদ্‌শা গোছ কিছু হয়ে পড়েছি! সব চেয়ে বেশী দুঃখ হচ্ছে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের ভক্তি দেখে। বন্ধুরা যদি ভক্তি করে, তাহ'লে বন্ধুদের ঘাড়ে পড়্‌ল একটা প্রকাণ্ড মুদ্গর! তাদিগে যতই বল্‌ছি ভো ভো আহম্মকবৃন্দ, তোমাদের

এ চোরের লক্ষণ; ওর্ফে অতিভক্তি সম্বরণ কর, ততই যেন তারা আমার আরো মহত্ত্বের পরিচয় পাচ্ছে!....বাইরে ত বেরোনো দায়! বেরোলেই অম্‌নি স্ত্রী-পুরুষের ছোট বড় মাঝারি প্রাণী আমার দিকে প্রাণপণে চক্ষু বিস্ফারিত করে' চেয়ে থাকে, আর অন্যকে আমার সবিশেষ ইতিবৃত্ত জ্ঞাত করিয়ে বলে, 'ঐ রে, ঐ লম্বা সুন্দর ছেলেটা যুদ্ধে যাচ্ছে।'

তারা কোন্‌টা দেখে আমার,—ভিতর—না বাহির?

(খ)

রেলপথে,

অণ্ডালের কাছাকাছি।—

যাক্, এতক্ষণে লোকের ভক্তিশ্রদ্ধার আক্রমণ হ'তে রেহাই পাওয়া গেল!—উঃ, যুদ্ধের আগেই এও ত একটা মন্দ যুদ্ধ নয়, রীতিমত দ্বন্দ্ব যুদ্ধ! এখন একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচি!

একটা ভাল কাজ করে' যা' আনন্দ আর আত্মপ্রসাদ মনে মনে লাভ করা যায়, তার অনেকটা নষ্ট করে দেয় বাইরের প্রশংসায়।

সব চেয়ে বেশী ভিড় হয়েছিল কলকাতায় আর হাবড়ার ষ্টেশনে।—ওঃ, সে কি বিপুল জনতা আর সে কি আকুল আগ্রহ আমাদিগকে দেখ্‌বার জন্যে! আমরা মঙ্গলগ্রহ হ'তে অথবা ঐ রকমেরই স্বর্গের কাছাকাছি কোন একটা জায়গা হ'তে যেন নেমে আস্‌ছি আর কি! যাঁদের সঙ্গে কখনও আলাপ করবারও সুযোগ পাইনি, তাঁরাও আমাদের সঙ্গে কোলাকুলি করেছেন আর অশ্রু গদ্‌গদ কণ্ঠে আশীষ করেছেন।

—ঐ যে হাজার হাজার পুর মহিলার হৃদয় গলে' সহানুভূতির পূত অশ্রু ঝর্‌ছে, ওতেই আমাদের ভবিষ্যৎ মঙ্গল সূচিত হচ্ছে।—সকলেরই দৃষ্টি আজ কত স্নেহ-আর্দ্র কোমল।

ষ্টেশনে ষ্টেশনে এই যে উপহারের আর বিদায়-সম্ভাষণের ধূমধাম, এতে কিন্তু বড্ডো বেশী ব্যতিব্যস্ত করে ফেল্‌ছে।—এ সব রাজ্যের জিনিষ খাবে কে?—আহা, না, না, এই রকম উপহার দিয়েই যদি ওরা তৃপ্ত হয়, একটা অশ্রুময় গৌরবে বক্ষ ভরে' উঠে, তবে তাই হোক।

মন। বুঝে নাও কি জন্যে এত ভক্তি-শ্রদ্ধা। ভেবে নাও কি ঘোর দায়িত্ব মাথায় কর্‌ছ।

আমার কম্পিত বুকে থেকে থেকে এখনও সেই আর্ত্ত বন্দনার ঘন ঘন প্রতিধ্বনি হচ্ছে, "বন্দে মাতরম্ বন্দে মাতরম্।"

রেলগাড়ী,

নিশিভোর।—

কি সুন্দর জলে ধোওয়া আকাশ! কি স্নিগ্ধ নিঝুম নিশি ভোর। সারা প্রকৃতি এখনও তন্দ্রালস নয়নে গা এলিয়ে দিয়ে পড়ে' রয়েছে। গোলাবী রং-এর মস্‌লিনের মত খুব পাতলা একটা আবছায়া তার ধূমভরা ক্লান্ত দেহটায় জড়িয়ে রয়েছে! আর একটু পরেই এমন সুন্দর প্রকৃতি বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করে' জেগে' উঠ্‌বে, তারপরে সেই তেম্‌নি নিত্যকার গোলমাল।

রিক্তের বেদন

ঐ, প্রত্যূষে।—

এখন বোধ হচ্ছে যেন সমস্ত দেশটা এইমাত্র বিছানা ছেড়ে' উঠে, উদাস-অলস নয়নে তার চেয়েও উদার আকাশটার দিকে চেয়ে রয়েছে। এখনও তার আঁখির পাতায় পাতায় ঘুমের জড়িমা মাখানো! হাই-তোলার মত মাঝে মাঝে দম্‌কা বাতাস ছুটে আস্‌ছে!

পাকা তবল্‌চির মত রেলগাড়ীটা কি সুন্দর কার্‌ফা বাজিয়ে যাচ্ছে, "পাঁটা কেটে ভাগ দিন্—পাঁটা কেটে ভাগ দিন্!" ইচ্ছা কর্‌ছে রেল-চলার এই কার্‌ফা তালের তালে তালে একটা ভৈরোঁ কি টোড়ী রাগিণী ভাঁজি, কিন্তু গান গাইবার মত এখন আদৌ সুর নেই যেন আমার কণ্ঠে।

মধুপুর।—

নিশি শেষের গ্যাসের আলো পড়ে' আমাদের মুখগুলো কি করুণ ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে! ঐ ফ্যাকাসে আলোর পাণ্ডুর আভা-প্রতিভাত হয়ে আমার ঘুমন্ত সৈনিক-বন্ধুদের সিক্ত নয়ন-পল্লবগুলি কি রকম চক্‌চক্ করছে! ও কিসের অশ্রুবিন্দু! বিদায় ব্যথার?—কে জানে!....

আজ এই প্রভাতের গ্যাসের আলোর মতই পাণ্ডুর রক্তহীন একটি তরুণ মুখ ক্ষণে ক্ষণে আমার বুকের মাঝে ভেসে উঠ্‌ছে! এখন যেন একটা বাষ্পময় কুয়াসার মত আধ-আলো আধ-আঁধার ভাব দেখা যাচ্ছে, ক'দিন ধরে' তার দৃষ্টিটিও ঠিক এই রকম ঝাপ্‌সা সজল হয়ে উঠেছিল! সে কিন্তু কখনও কিছু বলেনি—কিছু বল্‌তে পারিনি—আমিও কখনও মুখ ফুটে' কিছু বল্‌তে পারিনি—হাজার চেষ্টাতেও না! কি যেন একটা লজ্জামিশ্রিত কিছু আমায় প্রাণপণে চোখমুখ ঢেকে মানা কর্‌ত

—না, না, না, তবু কি করে' আমাদের দু'টি প্রাণের গোপন-কথা দুজনেই জেনেছিলুম।—ওঃ, প্রথম যৌবনের এই গোপন ভালোবাসা-বাসির মাধুর্য্য কত গাঢ়! আমার বিদায় দিনেও আমি একটি মুখের কথা বল্‌তে পারিনি তা'কে। শুধু একটা জমাট অশ্রুখণ্ড এসে, আমার বাকরোধ করে' দিয়েছিল! সেও কিছু বলেনি, যতদিন বাড়ীতে ছিলুম, ততদিন শুধু লুকিয়ে কেঁদেছে আর কেঁদেছে। তারপর বিদায়ের ক্ষণে তাদের ভাঙ্গা দেয়ালটা প্রাণপণে আঁকৃড়ে ধরে' রক্তভরা আঁখিতে ব্যাকুল বেদনায় চেয়েছিল! আর তার তরুণ সুন্দর মুখটি এই ভোরের গ্যাসের আলোর মতই করুণ ফ্যাকাসে হয়ে' গিয়েছিল!—মা যেন আমার গোপন-ব্যথার রক্ত ক্ষরা দেখেই সেদিন বলেছিলেন, "মা বাপ একবার শহিদাকে দেখা দিয়ে আয়। সে মেয়ে ত কেঁদে কেঁদে একেবারে নেতিয়ে পড়েছে।"—আমি তখন জোর করে' বলেছিলুম, "না মা, মরুকৃগে সে, আমি কিছুতেই দেখা কর্‌তে পার্‌ব না।"—হায়রে খামখেয়ালির অহেতুক অভিমান!

আজ বড় দুঃখে আমার সেই প্রিয় গানটা মনে পড়ছে,—

"দু'জনে দেখা হ'ল মধু-যামিনীতে—
কেন কথা কহিল না—চলিয়া গেল ধীরে?
নিকুঞ্জে দখিনাবায়, করিছে হায় হায়—
লতাপাতা দুলে' দুলে' ডাকিছে ফিরে ফিরে!—
দু'জনের আঁখিবারি গোপনে গেল ঝরে'—
দু'জনের প্রাণের কথা প্রাণেতে গেল মরে';
আর ত হ'লনা দেখা জগতে দোঁহে একা,
চিরদিন ছাড়াছাড়ি যমুনা-তীরে!"—

রিক্তের বেদন

উঃ, কি পান্‌সে উদাস আজকার ভোরের বাঙ্‌লাটা!—সদ্য-সুপ্তোত্থিত বনের বিহগের আনন্দ-কাকলী আজ যেন কি রকম অশ্রু-জড়িত আর দীর্ণ ব্যথিত।

এই গাড়ী ছাড়ার ঘণ্টার ঢং ঢং শব্দটা কত অরুন্তুদ গভীর! ঠিক যেন গির্জ্জায় কোন অতীত হতভাগার চিরবিদায়ের শেষ ঘণ্টাধ্বনি!

লাহোরের অদূরে

(নিশীথ)।

একটা বিরাট মহিষাসুরের মত কি একরোখা ছুট্ ছুটছে এই উন্মাদ বাষ্প-রথটা! ছোটো,…ওগো আগুন-আর-বাষ্প-পোরা-দানব, ছোটো! আর দোল্ দাও—দোল্ দাও এই তরুণ তোমার ভাইদের! ছোটো, ওগো, ক্ষ্যাপা দৈত্য, ছোট,—আর পিষে দিয়ে যাও তোমার এই লৌহময় পথটাকে! তোমার পথের পাশে ঘুমিয়ে যারা, তাদের জাগিয়ে দিয়ে যাও তোমার এই ছোটার শব্দে!…

নিশীথের জমাট অন্ধকার চিরে' শান্ত বনশ্রীকে চকিত শঙ্কিত করে' কত জোরে ছুটছে এই খাম্‌খেয়ালি মাথাপাগলা রাক্ষসটা,—কিন্তু তার চেয়েও লক্ষ গুণ বেগে আমার মত উল্টোদিকে ছুটেছে—যেখানে আমার সেই গোপন আকাঙ্ক্ষিতার বাষ্পরুদ্ধ চাপাকান্নার আকুলতা গ্রামের নিরীহ অন্ধকারকে ব্যথিত ছিন্নভিন্ন করে' দিচ্ছে! মন আমার তারি সাথে শ্বাস ফেলাচ্ছে, যে হতভাগিনীর ফুলে'-ফুলে'-উঠা দীর্ঘশ্বাস সরল-মেঠো বাতাসটিকে নিষ্ঠুরভাবে আহত করছে! আলুথালু আকুল-কেশ, ধূলিলুণ্ঠিত শিথিল-বসন, 'উজাড় করে'-দেওয়া আঁশু'য় ভেজা উপাধান,—সব যেন মনের চোখে দেখ্‌তে পাচ্ছি আর এই মধু-কল্পনার

স্নিগ্ধকারুণ্য আমার বুকে কেমন একটি গৌরবের ছোঁওয়া দিয়ে যাচ্ছে!

সমস্ত শাল আর পিয়াল বন কাঁপিয়ে যেন একটা পুত্রশোকাতুরা দৈত্য-জননী ডুকরে' ডুকরে' কাঁদছে 'ঔ—ঔ—ঔ!' আর মাতৃহারা দৈত্যশিশুর মত এই ক্ষ্যাপা গাড়ীটাও এপারে থেকে কাৎরে' কাৎরে' উঠছে, 'উ—উ—উঃ।'

(গ)

নৌশেরা।—

এস আমার বোবা সাথী, এস। আজ কতদিন পরে তোমায় আমায় দেখা! তোমার 'বুকে এমনি করে' আমার প্রাণের বোঝা নামিয়ে না রাখতে পারলে এতদিন আমার ঘাড় দুম্‌ড়ে পড়্‌ত!

আহ্‌ কি জ্বালা! এত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম, এত গাধাখাটুনির মাঝেও সেই একান্ত অন্ধস্মৃতিটার ব্যথা যেন বুকের উপর চেপে' বসে' আছে!....আজ তাকে ঝেড়ে ফেল্‌তে হবে! হৃদয়, শক্ত হও—বাঁধন ছিঁড়্‌তে হবে। যে তোমার কখনো হয়নি, যাকে কখ্‌খনো পাওনি,—যে তোমার হয়ত কখ্‌খনো হবেনা, যাকে কখ্‌খনো পাবেনা,—যার অজানা-ভালোবাসার স্মৃতিটাই ছিল—তোমার সারা বক্ষ বেদনায় ভরে', সেই শহিদার স্মৃতিটাকেও ধুয়ে মুছে ফেল্‌তে হবে! উঃ!···তা'··· পারবে? সাহস আছে? "না" বল্‌লে চল্‌বে না, এ যে পার্‌তেই হবে! মনে পড়ে কি আমাদের দেশের মা-ভাই-বোনের দেওয়া উপহার? বুঝেছিলে কি যে, ও গুলি তাঁদের দেওয়া দায়িত্বে, কর্ত্তব্যের গুরুভার? আমাদের কাজের উপর আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর

করছে। কষ্টিপাথরের মত সহ্যগুণ আমাদের থাকা চাই, তবে না জগতের লোকে যাচাই করে' নেবে যে, বাঙ্গালীরাও বীরের জাতি। এ সময় একটা গোপন স্মৃতি-ব্যথা বুকে পুষে' মুসড়ে' পড়লে চলবে না। তাকে চাপা দিতেও পারবে না, নিঃশেষে বিসর্জ্জন দিতে হবে! একেবারে বাইরের ভিতরের সব কিছু উজাড় করে' বিলিয়ে দিতে হবে, তবে না রিক্ততার—বিজয়ের পূর্ণরূপ ফুটে' উঠবে প্রাণে! অনেকে জীবন দিয়েছে, তবু এই প্রাণপণে-আঁকড়ে-ধরে'-থাকা মধু-স্মৃতি-টুকু বিসর্জ্জন দিতে পারেনি! তোমাকে সেই অসাধ্য সাধন করতে হবে! পারবে? সাধনার সে জোর আছে? যদি না পার, তবে কেন নিজকে 'মুক্ত,' 'রিক্ত', 'বীর' বলে' চেঁচিয়ে আকাশ ফাটাচ্ছ? যার প্রাণের গোপনতলে এখনও কামনা জেগে রয়েছে, সে ভোগী-মিথ্যুক আবার ত্যাগের দাবী করে কোন্ লজ্জায়? সে কাপুরুষের আবার বীরের পবিত্র শিরস্ত্রাণের অবমাননা করবার কি অধিকার আছে? দেশের জন্য প্রাণ দিবে যারা, তারা প্রথমে হবে ব্রহ্মচারী, ইন্দ্রিয়জিৎ!—

মাথার ওপর মা আমার ভাবী-বিজয়ী বীর-সন্তানের মুখের দিকে আশা উৎসুক নয়নে চেয়ে রয়েছেন, আর পায়ের নীচে এক তরুণী তার অশ্রুমিনতি ভরা ভাষায় সাধছে, "যেয়োনাগো প্রিয়, যেয়োনা!" কি করবে! নিশ্চয়ই পারবে! তুমি যে মায়ামমতাহীন কঠোর সৈনিক।

শক্ত হও হৃদয় আমার, শক্ত হও! আজ তোমার বিসর্জ্জনের দিন! আজ ঐ কাবুল নদীর ধারের উষর প্রান্তরটার মতই বুকটাকে রিক্ত শূন্য করে' ফেলতে হবে। তবে না তোমার সমস্ত তৃষ্ণা, সমস্ত সুখদুঃখ বৈরাগ্যের যজ্ঞকুণ্ডে আহুতি দিতে পূর্ণ রিক্ততার গান ধরবে,—

রিক্তের বেদন

"ওগো কাঙাল, আমায় কাঙাল করেছ
আরো কি তোমার চাই ?
ওগো ভিখারী, আমার ভিখারী,—
পলকে সকলি সঁপিছে চরণে আর তো কিছুই নাই !
আরো কি তোমার চাই ?"

*　　*　　*

কুর্দ্দিস্তান !—

পেয়েছি—পেয়েছি ! ওঃ, আজ দীর্ঘ এক বৎসরের পরে আমার প্রাণ কেন পূর্ণ-রিক্ততায় ভরে' উঠেছে বলে' বোধ হচ্ছে !...এই এক বৎসর ধরে' সে কি ভয়ানক যুদ্ধ মনের সাথে ! এ সময়ে কত কিছুই না মারা গেল ।...বাইরের যুদ্ধের চেয়ে ভিতরের যুদ্ধ কত দুরন্ত দুর্ব্বার ! রণজিৎ অনেকেই হ'তে পারে, কিন্তু মনজিৎ ক'জন হয় ? সে কেমন একটা প্রদীপ্ত কাঠিন্য আমাকে ক্রমেই ছেয়ে ফেল্‌ছে ! সে কি সীমাহীন বিরাট শূন্য হয়ে গেছে হৃদয়টা আমার ! এই কি রিক্ততা ?...ভোগও নেই—ত্যাগও নেই ; তৃষ্ণাও নেই—তৃপ্তিও নেই ; প্রেমও নেই—বিচ্ছেদও নেই ;—এ যেন কেমন একটা নির্ব্বিকার ভাব ! না ভাই, না, এমন তিক্ততা-ভরা রিক্ততা দিয়ে জীবন শুধু দুর্ব্বিসহই হয়ে পড়ে ! এত কঠিন অকরুণ মুক্তি ত আমি চাইনি ! এ যেন প্রাণহীন মর্ম্মর মন্দির !

তবু কিন্তু র'য়ে র'য়ে মর্ম্মরের শক্ত বুকে শুক্লা চাঁদিনীর মত করুণ মধুর হয়ে সে কার স্নিগ্ধশান্ত আলো হৃদয় ছুঁয়ে যায় ?—হায়, ছুঁয়ে যায় বটে, কিন্তু আর ত তেমন নুয়ে যায় না !...দেখেছ ? আমার অহঙ্কারী

মন তবু বল্‌তে চায় যে, ওটা নিজেকে নিঃশেষ করে বিলিয়ে দেওয়ার একটা অখণ্ড আনন্দের এক কণা শুভ্র জ্যোতিঃ।—তবু সে বল্‌বে না যে ওটা একটি বিসর্জ্জিতা প্রতিমার প্রীতির কিরণ!

আঃ, আজ এই আরবের উলঙ্গ প্রকৃতির বুকে মুখে মেঘমুক্ত শুভ্রজ্যোৎস্না পড়ে' তাকে এক শুক্লবসনা সন্ন্যাসিনীর মতই দেখাচ্ছে! এদেশের এই জ্যোৎস্না এক উপভোগ কর্‌বার জিনিস! পৃথিবীর আর কোথাও বুঝি জ্যোৎস্না এত তীব্র আর প্রখর নয়। জ্যোৎস্নারাত্রিতে তোলা আমার ফটোগুলি দেখে' কেউ বিশ্বাস কর্‌বে না যে, এগুলি জ্যোৎস্না-লোকে তোলা ফটো। ঠিক যেন শরৎ প্রভাতের সোনালি রোদ্দুর।...

হাঁ,—এ'ত মস্ত আর এক মুস্কিলে পড়লুম দেখছি।...ডালিম ফুলের মতই সুন্দর রাঙা টুকটুকে একটি বেদুইন যুবতী পাকৃড়ে বসেছে যে, তাকে বিয়ে কর্‌তেই হবে! সে কি ভয়ানক জোর জবরদস্তি! আমি যত বল্‌ছি 'না', সে তত একরোখা ঝোঁকে বলে, 'হাঁ, নিশ্চয়ই হাঁ!' সে বল্‌ছে যে, সে আমাকে বড্ডো ভালোবেসে ফেলেছে, আমি বল্‌ছি যে, আমি তাকে একদম্ ভালোবাসিনি। সে বল্‌ছে, তাতে কিছু আসে যায় না,—আমাকে ভালোবেসেছে, আমাকেই তার জীবনের চিরসাথী ব'লে চিনে নিয়েছে—বাস্! এই যথেষ্ট! আমার ওজর আপত্তির মানেই বোঝে না সে! আমি যতই তাকে মিনতি করে' বারণ করি সে ততই হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে বলে, "বাঃ—রে, আমি যে ভালোবেসেছি, তা তুমি বাস্‌বে না কেন?"—হায় একি জুলুম্!

ওরে মুক্ত! ওরে রিক্ত! তোর ভয় নেই, ভয় নেই! এই যে

হৃদয়টাকে শুষ্ক করে' ফেলেছিস, হাজার বছরের বৃষ্টিপাতেও এতে ঘাস্ জন্মাবে না, ফুল ফুট্‌বে না, এ বালি-ভরা নীরস সাহারায় ভালো-বাসা নেই।

যে ভালোবাসবে না তাকে ভালোবাসায় কে? যে বাঁধা দেবে না, তাকে বাঁধে কে?—"আমাকে যে বাঁধবে ধরে, এই হবে যার সাধন, সে কি অমনি হবে?"

কারবালা।—

এই সেই বিয়োগান্ত নিষ্করুণ নাটকের রঙ্গমঞ্চ,—যার নামে জগতের সারা মোস্‌লেম নরনারীর আঁখি-পল্লব বড় বেদনায় সিক্ত হয়ে ওঠে। এখানে এসেই মনে পড়ে সেই হাজার বছর আগের ধর্ম্ম আর দেশ রক্ষার জন্যে লক্ষ লক্ষ তরুণ বীরের হাস্‌তে হাস্‌তে 'শহিদ্' হওয়ার কথা! তেম্‌নি ব'য়ে যাচ্ছে সেই ফোরাত নদী, যার একবিন্দু জলের জন্য দুধের ছেলে, 'আস্‌গর' কচিবুকে জহর-মাখা তীরের আঘাত খেয়ে বাবার কোলে তৃষ্ণার্ত্ত চোখ দু'টি চিরতরে মুদেছিল! ফোরাতের এই মরুময় কূলে কূলে না জানি সে কত পবিত্র বীরের খুন বালির সঙ্গে মাখানো রয়েছে! আঃ, এ বালির পর্‌শেও যেন আমার অন্তর পবিত্র হয়ে গেল।

কয়েকটা পাষাণময় নিস্তব্ধ গৃহ খাড়া রয়েছে জমাট হয়ে—উদার অসীম আকাশেরই মত বিব্রত মরুভূমি তার বালুভরা আঁচল পেতে চলেই গিয়েছে,—ছোট্ট দুটি তৃষ্ণাতুর দুম্বা-শিশু 'মা' মা' ক'রে চীৎকার কর্‌তে কর্‌তে ফোরাতের দিকে ছুটে আস্‌ছে,—শিশিরবিন্দুর মত সুন্দর কয়েকটি বুভুক্ষু বালিকা ফোরাতের এক হাঁটু জলে নেমে আঁজ্‌লা আঁজ্‌লা জল পান ক'রে ক্ষুন্নিবৃত্তির চেষ্টা কর্‌ছে,—বালিতে

আর বাতাসে মাতামাতি,—এই সব মিলে কারবালার একটি করুণ চিত্র চোখের সামনে ফুটে উঠ্‌ছে!....

কার্‌বালা! কার্‌বালা!! আজ তোমারই আকাশ, তোমারই বাতাস, তোমারই বক্ষের মত আমার আকাশ বাতাস বক্ষ সব একটা বিপুল রিক্ততায় পূর্ণ!

সেদিনও সেই বেদুইন্ যুবতী গুলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল।—এই অবাধ্য অবুঝ তরুণী সে কি উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল আমার পিছু পিছু ছুট্‌ছে। আমি বাইরে বেরোলেই দেখ্‌তে পাই, সে একটা মস্ত আরবী ঘোড়ায় চ'ড়ে ফোরাতের কিনারে কিনারে আরবী গজল গেয়ে বেড়াচ্ছে! সে সুরের গিট্‌কারী কত তীব্র—কি তীক্ষ্ণ! প্রাণে যেন খেদং তীরের মত এসে বিঁধে!

আমি বল্‌লুম, "ছি গুল্‌, একি পাগলামি কর্‌ছ?"—আমার প্রাণে যে ভালোবাসাই নেই, তা ভালোবাস্‌ব কি করে?" সে ত হেসেই অস্থির। মানুষের প্রাণে যে ভালোবাসা নেই, তা সে নতুন শুন্‌লে।— আমি বিরক্ত হয়ে বল্‌লুম, "আমায় ভালোবাসবার তোমার ত কোন অধিকার নেই গুল্!"—সে আমার হাতটা তার কচি কিশলয়ের মত কম্পিত ওষ্ঠপুটে ছুঁইয়ে আর মুখটা পাকা বেদানার চেয়েও লাল করে' বল্‌লে, "অধিকার না থাকলে আমি ভালোবাস্‌ছি কি করে' হাসিন্?" —এ সরল যুক্তির পরে কি আর কোন কথা খাটে?

(ঘ)

আজিজিয়া।—

কি মুস্কিল! কোথায় কার্‌বালা আর কোথায় আজিজিয়া! আর সে কতদিন পরেই না এখানে এসেছি!........তবু গুল্ এখানে এল কি করে?

শুন্‌ছি এদেশের সুন্দরীরা এম্‌নি মুক্ত স্বাধীন আবার এম্‌নি একগুঁয়ে। একবার যাকে ভালোবাসে, তা'কে আর চিরজীবনেও ভোলে না।—এদের এ সত্যিকারের ভালোবাসা! এ উদ্দাম ভালো-বাসায় মিথ্যা নেই, প্রতারণা নেই।—কিন্তু আমি ত এ "সাপে-নেঙুলে" ভালোবাসায় বিল্‌কুল্‌ রাজি নই!—তা হ'লে আমার এ রিক্ততার অহঙ্কারের মাথা কাটা যাবে যে!·······

কা'ল যখন গুল্‌ আমার পাশ দিয়ে ঘোড়াটা ছুটিয়ে চলে গেল, তখন তার 'নরগেস্‌' ফুলের মত টানা চোখ দুটোয় কি একটা ব্যথা-কাতর মিনতি কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছিল? তার সেই চকিত চাওয়ার মৌনভাষা যেন কেঁদে কেঁদে কয়ে গেল, "বহুৎ দাগা দিয়া তু বেরহম্‌!"······

আমি আবার বল্‌লুম, "আমি যে মুক্ত, আমায় বাঁধতে পারবে না!······আমি যে রিক্ত, আমি তোমায় কি দিব?" সে তা'র ফিরোজা রঙ্‌এর উড়ানিটা দিয়ে আমার হাতদুটো এক নিমেষে বেঁধে ফেলে' বল্‌লে "এই ত বেঁধেছি!······আর তুমি রিক্ত বল্‌ছ হাসিন্‌? তা হোক্‌, আমার কুম্ভভরা ভালোবাসা হ'তে না হয় খানিক ঢেলে দিয়ে তোমার রিক্ত চিত্ত পূর্ণ করে' দোবো!"

আমি বল্‌ছি, 'না—না',—সে তত হাঁস্‌ছে আর বল্‌ছে, 'মিথ্যুক, মিথ্যুক, বেরহম্‌!'

সত্যিই ত, একি নতুন উন্মাদনা জাগিয়ে দিচ্ছ প্রাণে গুল্‌! কেন আমার শুষ্ক প্রাণকে মুঞ্জরিত করে' তুল্‌ছ—নাঃ, এখান হতেও সরে পড়্‌তে হবে দেখছি।—আমার কি একটা কথা মনে পড়ছে "সকল গরব হায়, নিমেষে টুটে যায়, সলিল বয়ে যায় নয়নে!"

ওরে আকাশের মুক্ত পাখী, ওরে মুগ্ধ বিহগী! একি শিকলি

পর্‌তে চাচ্ছিস্ তা তুই এখনি কিছুতেই বুঝতে পার্‌ছিসনে।—এড়িয়ে চল্—এড়িয়ে চল্ সোণার শিকল···'মানুষ মরে মিঠাতে, পাখী মরে আঠাতে!'

* * * * *

কুতল্-আমরা।—

(শেষ বসন্তের নিশীথ রাত্রি)—

আঃ, খোদা! কেমন করে' তুমি এমন দু' দুটো আসন্ন বন্ধন হ'তে আমায় মুক্তি দিলে, তাই ভাবছি আর অবিশ্রান্ত অশ্রু এসে আমাকে বিচলিত করে' তুল্‌ছে! এ মুক্তির আনন্দটা বড় নিবিড় বেদনায় ভরা! রিক্তের বেদন আমার মত এমনি বাঁধা আর ছাড়ার দুটানার মধ্যে না পড়লে কেউ বুঝতে পারবে না।······হাঁ, এই সঙ্গে একটা নীরস হাসির বেগ কিছুতেই যেন সাম্‌লাতে পার্‌ছিনে এই দুটো ব্যর্থ-বন্ধনের নিষ্ঠুর কঠিন পরিণাম দেখে'। তাই এই নিশীথে একটা পৈশাচিক হাঁসি হেঁসে গাইছি, "নিষ্ঠুর, এই করেছ ভালো! এমনি করে' হৃদয়ে মোর তীব্র দাহন জালো! এই করেছ ভালো।" কি হয়েছে, তাই বল্‌ছি।—

সেদিন চিঠি পেলুম, শহিদার, আমার গোপন ঈপ্সিতার বিয়ে হয়ে গেছে,—সে সুখী হয়েছে!···মনে হ'ল, যেন এক বন্ধন হ'তে মুক্তি পেলেম।—না, না, আর অসত্য বল্‌ব না আমার সেই সময় কেমন একটা হিংসা আর অভিমানে সারা বুক যেন আলোড়িত হয়ে উঠেছিল, তাই এই ক'দিন ধরে বড় হিংস্রের মতই ছুটে বেড়িয়েছি, কিন্তু শান্তি

পাইনি! এই আমাদের রক্তমাংসময় শরীর আর তারই ভিতরকার মনটা নিয়ে যতটা অহঙ্কার করি, বাইরে তার কতটুকু টিঁকে?—যেমনি মনটাকে পিটিয়ে পিটিয়ে এক নিমেষের জন্য দুরস্ত ক'রে রাখি, অমনি মনে হয় 'এই ত এক মস্ত দরবেশ হয়ে পড়েছি!' তারপরেই আবার কখন কোন ক্ষণে যে মনের মাঝে ক্ষুধিত বাসনা হাহাকার ক্রন্দন জুড়ে' দেয়, তা আর ভেবেই পাই না। আবার, পেলেও সেটাকে মিথ্যা দিয়ে ঢাকতে চাই!—হায়রে মানুষ! বুঝি বা এই বন্ধনেই সত্যিকার মুক্তি রয়েছে! কে জানে?……ভুলে' যাও অভাগিনী শহিদা, ভুলে যাও—সকল অতীত, সব স্মৃতির বেদনা, সব গোপন আকাঙ্ক্ষা সব কিছু। সমাজের চারিদিক অন্ধকার খাঁচায় বন্দিনী থেকে' কেন হতভাগিনী তোমরা এমন করে' অ-পাওয়াকে পেতে চাও? কেন তোমাদের মুগ্ধ অবোধ হিয়া এমন করে' তারই পায়ে সব ঢেলে' দেয়, যাকে সে কখ্খনো পাবে না? তবে কেন এ অন্ধ কামনা?……বিশ্বের গোপনতম অন্তরে অন্তরে তোমাদের এই ব্যর্থপ্রেমের বেদনা-ধারা ফল্গুনদীর মত বয়ে যাচ্ছে, প্রাণপণে এই মূঢ় ভালোবাসাকে রাখ্তে গিয়ে তোমার হৃদয় ফেটে' চৌচির হয়ে যাচ্ছে আর সেই বিদীর্ণ হৃদয়ের খুনে সমাজের আবরণ লালে লাল হয়ে গেছে তবু সে তোমাদের এই আপনি-ভালো-বাসার, পূর্ব্বরাগের প্রশ্রয় দেয়নি। তাই আজও পাথরের দেবতার মত বিশাল দণ্ডহস্তে সে তোমাদের সতর্ক পাহারা দিচ্ছে!

ভুলে যাও শহিদা, ভুলে যাও, নতুনের আনন্দে পুরাতন ভুলে' যাও! তোমাদের কোন ব্যক্তিত্বকে ভালোবাসবার অধিকার নেই, জোর করে' স্বামীত্বকে ভালোবাস্তে হবেই!……

আঃ, আজ কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদের চাঁদের ম্লান রশ্মি পাতলা মেঘের

বসন ছিঁড়ে কি মলিন করুণ হয়ে ঝর্‌ছে!—গত নিশির কথাটা মনে পড়্‌ছে আর গুরুব্যাথায় নিজেই কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছি!—

কাল রাত্তিরে এমনি সময়ে যখন এখানকার সান্ত্রীদের অধি-নায়করূপে রিভল্‌বার-হাতে চারিদিক পর্য্যবেক্ষণ করে বেড়াচ্ছি, তখন শুনলুম, পেছনের সান্ত্রী একবার গুরুগম্ভীর আওয়াজে 'চ্যালেঞ্জ' করলে, "হল্ট, হু কামস্ দেয়ার?" আর একবার সে জোরে বললে, "কৌন হায়? খাড়া রহো হিলো মৎ!—মাগো।—উঃ!" তারপর আর কোন আওয়াজ পাওয়া গেল না। শুধু একটা অব্যক্ত গোঙানি হাওয়ায় ভেসে এল! আমি উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে গিয়ে দেখলুম, লাল পোষাক পরা একটি আরব রমণী সান্ত্রীর রাইফল্‌টা নিয়ে ছুট্‌ছে আর সান্ত্রীর হিমদেহ নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রয়েছে। আমার আর বুঝ্‌তে বাকী থাক্‌ল না কেন এতদিন ধরে' আমাদের রাইফল্ চুরি যাচ্ছে আর সান্ত্রী মারা পড়্‌ছে! ওঃ কি দুর্দ্ধর্ষ-সাহসী এই বেদুইন রমণীরা! আমি পলকে স্থির হয়ে রমণীকে লক্ষ্য ক'রে গুলি ছাড়লুম, তার গায়ে লাগ্‌ল না। আর একটা গুলি ছাড়্‌তেই বোধ হয় নিজের বিপদ ভেবেই সে সহসা আমার দিকে মুখ ফিরে দাঁড়াল, তার বিদ্যুদ্বেগে পাকা সিপাইএর মত রাইফল্‌টা কাঁধে করে নিয়ে আমার দিকে লক্ষ করল; খট্ করে "বোল্ট" বন্ধ করার শব্দ হ'ল, তারপর কিজানি-কেন হঠাৎ সে রাইফল্‌টা দূরে ছুড়ে দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়্‌ল!—আত্মরক্ষার্থে আমি ততক্ষণ "বোল্ট" বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গেই উপুড় হ'য়ে শুয়ে পড়েছিলুম। এই সুযোগে এক লাফে রিভল্‌ভারটা নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়্‌তেই যা' দেখ্‌লুম, তাতে আমারও হাতের রিভল্‌ভারটা এক পলকে খসে পড়্‌ল।—তখন তা'র মুখের বোরকা খসে' পড়েছে আর মেঘ ছিঁড়ে

পূর্ণিমা-শশীর পূর্ণ শ্বেত জোছনা তার চোখে মুখে যেন নিঃশেষিত হয়ে পড়েছে! আমি স্পষ্ট দেখলুম, জানু পেতে বসে' বেদুইন যুবতী গুল্। তার বিস্ময়চকিত চাউনী ছাপিয়ে জ্যোৎস্নার চেয়েও উজ্জ্বল অশ্রুবিন্দু গড়িয়ে পড়ছে! একটা বেদনাতুর আনন্দের আতিশয্যে সে থর থর করে কাঁপছিল। তার প্রাণের ভাষা তারই ঐ অশ্রুর আখরে যেন আঁকা যাচ্ছিল, "এতদিনে এমন করে দেখা দিলে নিষ্ঠুর! ছি, এত কাঁদানো কি ভালো।" পাথর কেটে সে কে যেন আমার চোখে অনেক দিন পরে দুফোঁটা অশ্রু এনে দিল!

এ কি পরীক্ষায় ফেল্‌লে খোদা? আমার এ বিস্ময়মুগ্ধ ভাব কেটে যাবার পরই মনে হ'ল, কি করা উচিত? ভয় হ'ল আজ বুঝি সব সংযম, ত্যাগ-সাধনা এই মুগ্ধা তরুণীর চোখের জলে ভেসে যায়! —আবার এই সঙ্গে মনে পড়্‌ল শহিদার কথা, এম্‌নি একটি কচি অশ্রুস্নাত মুখ!……

সমস্ত কুতল্—আমরার মরুভূমি আর পাহাড়ের বুকে দোল্ খাইয়ে কার্ জলদ্‌মন্দ্র আওয়াজ ছুটে এল, সেনানী—হুশিয়ার!'

আবার আমি যেন দেখ্‌তে পেলুম, আশীষ-বারির মঙ্গল ঝারি আর অশ্রু সমুজ্জ্বল বিজয়মাল্য হস্তে বাংলা আমাদের দিকে আশা-উত্তেজিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে!—প্রেমের চরণে কর্ত্তব্যের বলিদান দেব? না, না কখ্‌খনো না!

আপ্‌না আপ্‌নি আমার কঠিন মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, 'খোদা হৃদয়ে বল দাও! বাহুতে শক্তি দাও! আর কর্ত্তব্যবুদ্ধি উদ্বুদ্ধ কর প্রাণের শিরায় শিরায়!'……

নিমেষে আমার সমস্ত রক্ত উষ্ণ হয়ে ভীমতেজে নেচে উঠল। আর

সঙ্গে সঙ্গে বজ্রমুষ্টিতে পিস্তলটা সোজা করে ধরলুম। সমস্ত স্তব্ধ প্রকৃতির বুকে বাজপড়ার মত কড়্‌কড়্‌-করে' কার হুকুম এল, 'গুলী করো!'

ক্রুম্! ক্রুম্!! ক্রুম্!!!......একটা যন্ত্রণা-কাতর কাৎরানি—"আম্মা! —মাঃ!! আঃ!!"...

তাপরেই সব শেষ।

* * * *

তারপরেই আমি আত্মবিস্মৃত হ'য়ে পড়লুম!....ছুটে গিয়ে গুলের এলিয়ে-পড়া দেহলতা আমার চিরতৃষিত অতৃপ্ত বুকে বিপুল বলে চেপে ধরলুম! তারপর তার বেদনাস্ফুরিত ওষ্ঠপুটে আমার পিপাসী ওষ্ঠ নিবিড়ভাবে সংলগ্ন ক'রে আর্ত্ত-কণ্ঠে ডাকলুম 'গুল্—গুল্, গুল্!'—প্রবল একটা জলো-হাওয়ার নাড়া পেয়ে শিউলি ঝরে পড়ার মত শুধু একরাশ্‌ ঝরা অশ্রু তা'র আমার মুখে বুকে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল।

অবশ অলস তা'র ভুজলতা দিয়ে বড় কষ্টে সে আমার কণ্ঠ বেষ্টন ক'রে ধর্‌লে তারপর আরো কাছে—আরো কাছে সংলগ্ন হয়ে নিসাড় নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রইল!...মেঘের কোলে লুকিয়ে-পড়া চাঁদের পান্‌সে জ্যোৎস্না তার ব্যথা-কাতর শুষ্ক মুখের সে কি একটা স্নিগ্ধ করুণ মহিমশ্রী ফুটিয়ে তুলেছিল!...সেই অকরুণ স্মৃতিটাই বুঝি আমার ভাবী জীবনের সম্বল, বাকী পথের পাথেয়!...অনেকক্ষণ পরে সে আস্তে চোখ খুলে আমার মুখের পানে চেয়েই চোখ বুজে বললে "এই "আশেকের" হাতে "মাশুকের" মরণ বড় বাঞ্ছনীয় আর মধুর, নয় হাসিন্? আমি শুধু পাথরের মত বসে' রইলুম। আর তার মুখে এক

টুক্‌রা মলিন হাসি কেঁপে কেঁপে মিলিয়ে গেল! শেষের সে তৃপ্ত হাসি তার ঠোঁটে আর ফুট্‌ল না। শুধু একটা ভূমিকম্পের মত কিসের ব্যাকুল শিহরণ সঞ্চরণ করে' গেল!...তার বুকের লোহুতে আর আমার আঁখের আঁশুতে এক হয়ে বয়ে যাচ্ছিল! সে তখনও আমার নিবিড় নিষ্পেষণে আঁকড়ে ধরে' ছিল আর তা'র চোখে মুখে চিরবাঞ্ছিত তৃপ্তির স্নিগ্ধ শান্তশ্রী ফুটে উঠেছিল।—এই কি সে চাচ্ছিল? তবে এই কি তার নারী জীবনের সার্থকতা?......আর একবার—আর একবার—তার মৃত্যু-শীতল ওষ্ঠপুটে আমার শুষ্ক অধরোষ্ঠ প্রাণপণে নিষ্পেষিত করে' হুমড়ি পড়ে' ডাক দিলুম,—'গুল্, গুল্, গুল্! বাতাসে আহত একটা কঠোর বিদ্রূপ আমায় মুখ ভেংচিয়ে গেল, 'ভুল—ভুল—ভুল!'

আবার সমস্ত মেঘ ছিন্ন করে চাঁদের আলোর যেন 'ফিং' ফুট্‌ছিল। গুলের নিঝুম দেহটা সমেত আমি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিলুম, এমন সময় বিপুল ঝঞ্ঝার মত এসে এক প্রৌঢ়া বেদুইন মহিলা আমার বক্ষ হ'তে গুল্‌কে ছিনিয়ে নিলে এবং উন্মাদিনীর মত ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল, 'গুল্—আম্মা,—গুল্!'

*　　*　　*　　*

প্রৌঢ়া তার মৃতা কন্যাকে বুকে চেপে ধরে আর একবার আর্ত্তনাদ করে' উঠতেই আমি তার কোলে মূর্চ্ছাতুরের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে ডাকলুম, "আম্মা—আম্মা!" মা'র মত গভীর স্নেহে আমার ললাট চুম্বন করে প্রৌঢ়া কেঁদে উঠ্‌ল, 'ফরজন্দ্—ফরজন্দ্!' কাবেরী জলপ্রপাতের চেয়েও উদ্দাম একটা অশ্রুস্রোত আমার মাথায় ঝ'রে পড়ল।...

আঃ, কত নিদারুণ সে কন্যাহীনা মার কান্না!

*　　*　　*　　*

আমি আবার প্রাণপণে গা ঝেড়ে উঠে কাৎরে উঠলুম, "আম্মা—আম্মা—মা" !—একটা রুদ্ধ কণ্ঠের চাপা কান্নার প্রতিধ্বনি পাগল হাওয়ায় ব'য়ে আন্‌লে—'ফর্‌জন্দ্ !'……

অনেক দূরে·· পাহাড়ের ওপার হ'তে, সে কোন্ শোকাতুরা মাতার কাঁদনের রেশ্ ভেসে আস্‌ছিল, 'আহ্—আহ্ আহ্ !'···আরবী ঘোড়ার উর্দ্ধশ্বাসে ছোটার পাষাণে আহত শব্দ শোনা গেল—খট্ খট্ খট্ ! ! !

(৬)

করাচি ।—

(মেঘম্লান সন্ধ্যা,—সাগর বেলা)—

আমি আজ কাঙ্গাল না রাজাধিরাজ ? বন্দী না মুক্ত ? পূর্ণ না রিক্ত···

একা এই ম্লান মৌন আরব সাগরের বিজন বেলায় বসে' তাই ভাবছি আর ভাবছি। আর আমার মাথার ওপর মুক্ত আকাশ বেয়ে মাঝে মাঝে বৃষ্টি ঝর্‌ছে—রিম্ ঝিম্ ঝিম্ ।

বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী

বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী

(ক)

[বাঙ্গালী পল্টনের একটি বওয়াটে যুবক আমার কাছে তাহার কাহিনী বলিয়াছিল নেশার ঝোঁকে: নীচে তাহাই লেখা হইল। সে বোগদাদে গিয়া মারা পড়ে।—]

“কি ভায়া! নিতান্তই ছাড়বে না? একদম এঁটেল মাটির মত লেগে থাকবে? আরে, ছোঃ! তুমি যে দেখ্‌ছি চিটে গুড়ের চেয়েও চাম্‌চিটেল! তুমি যদিও হচ্ছ আমার এক গ্লাসের ইয়ার, তবুও সত্যি বল্‌তে কি, আমার সে সব কথাগুলো বল্‌তে কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ হয়। কারণ খোদা আমায় পয়দা করবার সময় মস্ত একটা গলদ করে বসেছিলেন, কেন না চামড়াটা আমার ক’রে দিলেন হাতীর চেয়েও পুরু, আর প্রাণটা করে দিলেন কাদার চেয়েও নরম! আর কাজেই দু’ চার জন মজুর লাগিয়ে আমার এই চামড়ায় মুগুর বসালেও আমি গোঁপে তা দিয়ে বল্‌ব, “কুচ্‌পরওয়া নেই”, কিন্তু আমার এই ‘নাজোক্‌’ জানটায় একটু আঁচড় লাগলেই ছোট্ট মেয়ের মত চেঁচিয়ে উঠ্‌বো! তোমার ‘বিরাশী দশ আনা’ ওজনের কিলগুলো আমার এই স্থূল চর্ম্মে স্রেফ্‌ আরাম দেওয়া ভিন্ন আর কোনো ফলোৎপাদন করতে পারে না, কিন্তু যখনই পাকড়ে বস, “ভাই তোমার সকল কথা খুলে বলতে হবে,” তখন আমার অন্তরাত্মা ধুক্‌ধুক্‌ ক’রে ওঠে,—পৃথিবী

ঘোরার ভৌগলিক সত্যটা তখন হাড়ে হাড়ে অনুভব করি। চক্ষেও যে সর্ষপ পুষ্প প্রস্ফুটিত হ'তে পারে বা জোনাকী পোকা জ্বলে' উঠ্‌তে পারে' তা আমার মত এই রকম শোচনীয় অবস্থায় পড়লে তুমিও অস্বীকার করবে না।

(খ)

"হাঁ, আমার ছোটকালের কোন কথা বিশেষ ইয়াদ হয় না। আর আবছায়া রকমের একটু একটু মনে পড়লেও তাতে তেমন কোন রস বা রোমান্স্ (বৈচিত্র্য) নেই!—সেই সরকারী রাম-শ্যামের মত পিতা-মাতার অত্যধিক স্নেহ, পড়ালেখায় নবডঙ্কা, ঝুল্‌ঝাপ্‌পুর ডাণ্ডাগুলি খেলায়, দ্বিতীয় নাস্তি,' দুষ্টামি-নষ্টামিতে নন্দদুলাল কৃষ্ণের তদানীন্তন অবতার, আর ছেলেদের দলে অপ্রতিহত প্রভাবে আলেকজাণ্ডার-দি-গ্রেটের ক্ষুদ্র সংস্করণ! আমার অনুগ্রহে ও নিগ্রহে গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বিশেষ খোশ ছিলেন কি না, তা আমি কারুর মাথায় হাত দিয়ে বলতে পারি না; তবে সকলেই আমার পরমার্থ কল্যাণের জন্য যে সকাল সন্ধ্যে প্রার্থনা করত সেটা আমার তীক্ষ্ণ শ্রবণেন্দ্রিয় নাওয়াকেফ্‌ ছিল না। একটা প্রবাদ আছে, "উৎপাত করলেই চিৎপাত হ'তে হয়।" সুতরাং এটা বলাই বাহুল্য যে, আমার পক্ষেও উক্ত মহাবাক্যটির ব্যতিক্রম হয় নি, বরং ও কথাটা ভয়ানক ভাবেই আমার উপর খেটে-ছিল; কারণ ঘটনাচক্রে যখন আমি আমার জননীর কক্ষচ্যুত হয়ে সংসারের কর্ম্মবহুল ফুটপাতে চিৎপাত হ'য়ে পপাত হলুম, তখন কত শত কর্ম্মব্যস্ত সবুট-ঠ্যাং যে অহম-বেচারার ব্যথিত পাঁজরের উপর দিয়ে চলে' গেল, তার হিসেব রাখ্‌তে শুভঙ্কর দাদাও হার মেনে যায়।—থাক্,

আমার সে সব নীরস কথা আউড়িয়ে তোমার আর পিত্তি জ্বালাব না। শুন্‌বে মজা?

একদিন পাঠশালায় বসে' আমি বঙ্কিমবাবুর মুচিরাম গুড়ের অনুকরণে ছেলেদের মজলিস্ সর-গরম করে' আবৃত্তি কর্‌ছিলুম, "মাননীয় রাধে! একবার বদন তুলে গুড়ুক খাও!" এতে শ্রীমতী রাধার মানভঞ্জন হয়েছিল কি না জানবার অবসর পাইনি, কারণ নেপথ্যে ভুজঙ্গ প্রয়াত ছন্দে "আরে রে দুর্ব্বৃত্ত পামর" বলে' হুঙ্কার ক'রে আমার ঘাড়ে এসে পড়লেন—সশরীরে আমাদের আর্কমার্কা পণ্ডিত মশাই! যবনিকার অন্তরালে যে যাত্রার ভীম মশাইয়ের মত ভীষণ পণ্ডিত মশাই অবস্থান কর্‌ছিলেন, এ নাবালকের একেবারেই জানা ছিল না।—তার ক্রোধ-বহ্নি যে দুর্ব্বাসার চেয়েও উদ্দীপ্ত হযে উঠেছিল তা আমি বিশেষ রকম উপলব্ধি করলুম তখন, যখন তিনি একটা প্রকাণ্ড মেঘের মত এসে আমার নাতি-দীর্ঘ শ্রবণেন্দ্রিয় দুটি ধরে' দেওয়ালের সঙ্গে মাথাটার বিষম সংঘর্ষণ আরম্ভ করলেন। তখনকার পুরোদস্তুর সংঘর্ষণের ফলে কোন নূতন বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার উদ্ভাবন হয়নি সত্য, কিন্তু আমার সর্ব্ব শরীরের 'ইলেকট্রিসিটী' যে সাংঘাতিক রকম ছুটাছুটি করেছিল, সেটা অস্বীকার করতে পারব না। মা'র খেয়ে খেয়ে ইটপাটকেলের মত আমার এই শক্ত শরীরটা যত না কষ্ট অনুভব করেছিল, তাঁর সালঙ্কার গালাগালির তোড়ে তার চেয়ে অনেক কষ্ট অনুভব করেছিল আমার মন্‌টা। আদৌ মুখরোচক নয় এরূপ কতকগুলো অখাদ্য তিনি আমার পিতৃপুরুষের মুখে দিচ্ছিলেন, এবং একেবারেই সম্ভব নয় এরূপ কতকগুলো ঘনিষ্ট সম্পর্কের দাবী আমার কাছে করেছিলেন। তাঁর পাঁচপোয়া পরিমিত চৈতন্য চুট্‌কিটা ভেক-ছানা-সম শিরোপরি অস্বাভাবিক রকমের লম্ফঝম্ফ প্রদান কর্‌ছিল।

সঙ্গে সঙ্গে খুব হাসিও পাচ্ছিল, কারণ 'চৈতন্ তেরে উঠার' নিগূঢ় অর্থ সেদিন আমি সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করেছিলুম! ক্রমে যখন দেখলুম, তাঁর এ প্রহারের কবিতায় আদৌ যতি বা বিরামের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না, তখন আর বরদাস্ত হ'ল না! জানত, 'পুরুষের রাগ আনাগোনা করে,' আমিও তাই, ঐখানেই একটা হেস্তনেস্ত করে' দেবার অভিপ্রায়ে তাঁর খাঁড়ার মত নাকটায় বেশ মাঝারি গোছের একটা ঘুসি বাগিয়ে দিয়ে বীরের মত সটান স্বগৃহাভিমুখে হাওয়া দিলুম। বাড়ী গিয়েও আমি নিজেকে নিরাপদ মনে করলুম না। তাই পিতৃভয়ে সেঁধুলাম গিয়ে একেবারে চালের মরাইএ; উদ্দেশ্য, এরূপ নিভৃত স্থান হ'তে কেউ আর সহজে আবিষ্কার করতে পারবেন না—কি জানি কখন কি হয়! খানিক পরে—আমার সেই গুপ্তপুর হ'তেই শুন্‌তে পেলুম, পণ্ডিত মশাই ততক্ষণে সালঙ্কারে আমার জন্মদাতার কাছে প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করে' বুঝাচ্ছিলেন যে, আমার মত দুর্দ্ধর্ষ বাউণ্ডেলে ছোক্‌রার লেখা পড়া ত "ক" অক্ষর গোমাংস, তদুপরি গুরুমহাশয়ের নাসিকায় গুরুপ্রহার ও গুরুপত্নীর নিন্দাবাদ অপরাধে আপাততঃ এই দুনিয়াতেই আমাকে লোখুঠুঁটোর মত চাটু হস্তে মাছি মারতে হ'বে, অর্থাৎ কুষ্ঠব্যাধি হবে, তারপর নরকে যাতে আমার 'স্পেশাল' (বিশেষ) শাস্তির বন্দোবস্ত হয়, তার জন্যেও নাকি তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে ঠিকঠাক করতে পারেন! প্রথমতঃ অভিশাপটার ভয়ে একটু বিচলিত হয়ে পড়েছিলুম। গুরুপত্নীর নিন্দাবাদ কথাটা আমি প্রথমে বুঝ্‌তে পারিনি, পরে অবগত হলুম, পণ্ডিত মশাইয়ের অর্দ্ধাঙ্গিনীর নামও নাকি শ্রীমতী রাধা,—আর তাঁর এক-আধটু গুড়ুক খাওয়ারও নাকি অভ্যাস আছে, অবিশ্যি সেটা স্বামী দেবতার অগোচরেই সম্পন্ন

হয়,—আমি নাকি তাই দেখে এসে ছেলেদের কাছে স্বহস্তে গুড়ুক সেজে অভিমানিনী শ্রীমতী রাধার মানভঞ্জনার্থ করুণ মর্ম্মস্পর্শী স্বরে উপরোধ করছিলুম,—"মানময়ী রাধে একবার তুলে গুড়ুক খাও"—আর পণ্ডিত মশাই অন্তরালে থেকে সব শুন্‌ছিলেন।—আমার আর বরদাস্ত হলো না, চালের মরাইএ থেকেই উস্‌খুস্‌ করতে লাগলুম, ইতিমধ্যে গরমেও আমি রীতিমত গলদঘর্ম্ম হয়ে উঠেছিলুম। আমি মোটেই জানতুম না পণ্ডিত মশাইয়ের গিন্নীর নাম শ্রীমতী রাধা—আর তিনি যে গুড়ুক খান্‌ তা ত বিল্‌কুলই জানতুম না। কাজেই এতগুলো সত্যের অপলাপে আমি আর মাথা ঠিক রাখ্‌তে পারলুম না, তুড়ুক করে চা'লের মরাই হ'তে পিতৃসমীপে লাফিয়ে পড়ে', আমার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করবার জন্য অশ্রু গদগদ-কণ্ঠে অকাট্য যুক্তি প্রমাণ প্রয়োগ ক'রতে লাগলুম, কিন্তু ততক্ষণ ক্রোধান্ধ পিতা আমার আপিল অগ্রাহ্য ক'রে ঘোড়ার গোগালচির মত আমার সামনের লম্বা চুলগুলো ধরে দমাদ্দম প্রহার জুড়ে দিলেন। বাস্তবিক সে রকম প্রহার আমি জীবনে আশা করিনি।—চপেটাঘাত, মুষ্টাঘাত, পদাঘাত ইত্যাদি চারহাত পায়ের যত রকম আঘাত আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে, সব যেন রবিবাবুর গানের ভাষায় "শ্রাবণের ধারার মত" পড়্‌তে লাগ্‌ল আমার মুখের 'পরে—পিঠের 'পরে। সেদিনকার পিটুনি খেয়ে আমার পৃষ্ঠদেশ বেশ বুঝতে পেরেছিল যে তার "পিঠ" নাম সার্থক হয়েছে! একেই আমাদের ভাষায় বলে, "পেঁদিয়ে বৃন্দাবন দেখিয়ে দেওয়া।" বৃন্দাবন না দেখি তার পরদিনই কিন্তু বাবা আমায় বর্দ্ধমান এনে 'নিউস্কুলে' ভর্ত্তি করে দিলেন! কি করি আমি নাচারের মত সব সহ্য করতে লাগলুম—কথায় বলে "ধরে, মারে না, সয় ভাল।"

(গ)

"প্রথম প্রথম সহরে এসে আমার মত পাড়াগেঁয়ে গোঁয়ারকে বিষম বিব্রত হয়ে উঠতে হ'য়েছিল, বিশেষ ক'রে সহুরে ছোকরাদের দৌরত্তিতে। সে ব্যাটারা পাড়াগেঁয়ে ছেলেগুলোকে যেন ইঁদুর-প্যাঁচার মত পেয়ে বসে। যা হোক অল্পদিনেই আমি সহুরে কায়দায় কেতাদুরস্ত হয়ে উঠলুম। ক্রমে 'অহম' পাড়াগেঁয়ে ভূতই আবার তাদের দলের একজন হুমরো চুম্‌রো ওস্তাদ ছোকরা হয়ে পড়ল। সেই—আগেকার পগেয়া—খচ্চর ছেলেগুলোই এখন আমায় বেশ একটু সমীহ করে'চলতে লাগলো। —বাবা, এ শর্ম্মার কাছে বেঁড়ে-ওস্তাদি, এ ছেলে হচ্ছে অষ্টধাতু দিয়ে তৈরী! দেখতে দেখতে পড়ালেখায় যত না উন্নতি করলুম, তার' চেয়ে বহুল পরিমাণে উন্নতি করলুম রাজ্যের যত দুষ্টোমীর গবেষণায়। তখন আমায় দেখলে বর্দ্ধমানের মত পবিত্র স্থানও তটস্থ হয়ে উঠত। ক্রমে আমাদের মস্ত একটা দল পেকে উঠল। পুলিশের ঘাড়ে দিনকতক এগার-ইঞ্চি ঝাড়তেই তারা আমাদের সঙ্গে গুপ্ত সন্ধি করে ফেল্‌লে। এইরূপে ক্রমেই আমি নিচুদিকে গড়িয়ে যেতে লাগলুম—তাই ব'লে যে আমাদের দিয়ে কোন ভাল কাজ হয়নি, তা বল্‌তে পারবে না। মিশন, কুষ্ঠরোগ, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতিতে আমাদের এই বওয়াটে ছেলেদের দল যা করেছে তার শতাংশের একাংশও করে উঠ্‌তে পারেনি ঐ গোবেচারা নিরীহ ছাত্রের দল। তারা আমাদের মত অমন অদম্য উৎসাহ ক্ষমতা পাবে কোথায়? তারা শুধু বইএর পোকা। বর্দ্ধমান যখন ডুবে যায়, তখন আমরাই সহরের সিকি লোককে বাঁচিয়েছিলুম, সে সময় আমাদের দলের অনেকে নিজের জীবন উৎসর্গ করে, আর্ত্তের

জীবন রক্ষা করেছিল। কন্‌ফারেন্সের সভা-সমিতির চাঁদা আদায়ের প্রধান উদ্যোগ আয়োজনের প্রধান পাণ্ডা ছিলুম আমরা। আমাদেরই চেষ্টায় 'স্পোর্টস্', 'জিম্‌নাষ্টিক', 'সার্কাস', 'থিয়েটার', 'ক্লাব' প্রভৃতির আড্ডাগুলির অস্তিত্ব অনেক দিন ধ'রে লোপ পায়নি।

পিতার অবস্থা খুব সচ্ছল না হলেও মাসহারাটা ঠিক রকমেই পাঠাতেন। তিনি ত আর আমার এতদূব উন্নতির আশা করেন নি, আর এত খবরও রাখ্‌তেন না। কারণ কোন ক্লাশে আমার 'প্রমোশন' ষ্টপ্‌ হয় নি। বহু গবেষণার ফলেও হেডমাষ্টার মহাশয় আবিষ্কার করতে পারেন নি—আমার মত বওয়াটে ছেলেরা কি করে পাসের নম্বর রাখে—ভায়া, ঐ খানেই ত geniusএর (প্রতিভার) পরিচয়!—"চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা।" পরীক্ষার সময় চার পাঁচ জোড়া অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি আমার পেছনে লেগে থাকৃতই, কিন্তু ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর যার কূল কিনারা পান না, তাকে ধরবেন 'পদার ভাই গৌরাশঙ্কর!' তা ছাড়া খালি চুরি বিদ্যায় কি চলে? এতে অনেক মাথা ঘামাতে হয়। পরীক্ষকের ঘর হ'তে তার ছেলে বা অন্য কোন ক্ষুদ্র আত্মীয়ের থ্রু দিয়ে রজত চক্রের বিনিময়ে খাতাটি বেমালুম বদলে ফেলা, প্রেস হ'তে প্রশ্ন চুরি, প্রভৃতি অনেক বুদ্ধিই এ শর্ম্মার আয়ত্ত ছিল। সে সব শুনলে তোমার চক্ষু চড়কগাছ হয়ে উঠ্‌বে!—যা হোক, এই রকমেই 'যেন তেন প্রকারেণ' থার্ডক্লাশের চৌকাঠে পা দিলুম গিয়ে।

বাড়ী খুব কম যেতুম, কারণ পাড়াগাঁ তখন আর ভাল লাগত না। পিতাও বাড়ী না গেলে দুঃখিত হতেন না, কারণ তাঁর বিশ্বাস ছিল, আমি এইবার একটা কিছু না হয়ে যাই না। আমাদের গ্রামের কুলে আমিই

পড়্‌তে এসেছিলুম ইংরেজী স্কুলে, তার উপর আমি নাকি পাসগুলো পক্ষীরাজ ঘোড়ার মত তড়াত্তর ডিঙ্গিয়ে যাচ্ছিলুম! কেবল একজনের আঁখি দুটী সর্ব্বদাই আমার পথপানে চেয়ে থাক্‌ত, তিনি আমার স্নেহময়ী জননী! মায়ের মন ত অত শত বোঝে না, তাই দুমাস বাড়ী না গেলেই মা কেঁদে আকুল হোতেন। সংসারে মার কাছ ভিন্ন আর কারুর কাছে একটু স্নেহ আদর পাইনি! দুষ্ট বদমায়েস ছেলে বলে' আমায় যখন সকলেই মারত ধম্‌কাত, তখন মা'ই কেবল আমায় বুকে করে সান্ত্বনা দিতেন। আমার এই দুষ্টোমিটাই যেন তাঁর সব চেয়ে ভাল লাগ্‌ত। আমার পিঠে প্রহারের দাগগুলোয় তেল মালিশ করে দিতে দিতে কতদিন তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রুর নদী বয়ে গেছে।

যখন থার্ড ক্লাশে উঠলুম, তখন বোধ হয় মায়ের জিদেই বাবা আমায় চতুষ্পদ করে' ফেললেন, অর্থাৎ বিয়ে দিলেন। আমি 'কটিদেশ বন্ধন পূর্ব্বক' নানা ওজর আপত্তি দেখাতে লাগলুম, কিন্তু মায়ের আদালতে ও তাঁর অশ্রুজলের ওকালতিতে আমার সমস্ত ওজর বাতিল ও নামাঞ্জুর হয়ে গেল। কি করি, যখন শুভদৃষ্টি হয়ে গেল, তখন ত আর কথাই নাই! তা ছাড়া, কনে'টি মন্দ ছিল না, আজকালকার বাজারে পাড়াগাঁয়ে ও-রকম কনে' শ'য়ে একটি মেলে না। বয়সও বার তের হয়েছিল। ঐ বার তের বছরের কিশোরীটিকেই মা নাকি সোমত্থ মেয়ে দেখে বউ করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিলেন। আমারও বয়স তখন উনিশের কাছাকাছি, এতেই নাকি মেয়েমহলে মাকে কত কথা শুনতে হোত। প্রথম প্রথম কনে' বৌ একটি পুঁটুলিরই মত জড়সড় হয়ে তার নির্দ্দিষ্ট একটি কোণে চুপ করে' বসে থাকৃত। নব-বধূদের নাকি চোখ তেড়ে চাইতে নেই, তাই সে প্রায়ই চোখ বুঁজে

থাক্‌ত। কিন্তু অনবরত চোখ বুজে থাকা, সেও এক বীভৎস ব্যাপার, তাই সে দু-একবার অন্যের অলক্ষ্যে ভয়-চকিত দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকিয়ে নিত, যদি এই বেহায়াপনা কেউ দেখে ফেলে, তা' হলেই মহাভারত অশুদ্ধ আর কি! আমাকে দেখলে ত আর কথাই নেই নিজেকে কাছিমের মত তৎক্ষণাৎ সাড়ী ওড়না প্রভৃতির ভিতর ছাপিয়ে ফেলতো। তখন একজন প্রকাণ্ড অনুসন্ধিৎসু লোকের পক্ষেও বলা দুঃসাধ্য হয়ে উঠতো, ওটা মানুষ, না কাপড়ের একটা বোঁচকা! তবে এটা আমার দৃষ্টি এড়াত না যে আমি অন্যদিকে চাইলেই সে তার বেনারসী সাড়ীর ভিতর থেকে চুরি করে' আমার দিকে চেয়ে দেখত, কিন্তু আমি তার দিকে চাইতে না চাইতেই সে সটান্ চোখ দুটোকে বুজে ফেলে গম্ভীর হয়ে বসে' থাকত, যেন আমায় দেখবার তার আদৌ গরজ নাই। আমি মুখ টিপে হাস্‌তে হাস্‌তে পালিয়ে এলে বাড়ীময় উচ্চৈঃস্বরে বউয়ের লজ্জাহীনতার কথা প্রকাশ করে' ফেলতুম। মা ত হেসেই অস্থির। বলতেন "হাঁরে, তুই কি জনম এই রকম ক্ষ্যাপাই থাকবি?' আমার ভগ্নিগুলি কিন্তু কিছুতেই ছাড়বার পাত্র নন, তাঁরা বউএর কাছে রীতিমত কৈফিয়ৎ তলব করতেন। সে বেচারির তখনকার বিপদটা ভেবে আমার খুব আমোদ হোত, আমি হেসে লুটোপুটি যেতুম। যাহোক্, এ একটা খেলা মন্দ লাগছিল না। ক্রমে আমি বুঝতে পারলুম, কিশোরী কনে' আমায় ভালবাসতে আরম্ভ করেছে। আমি কিন্তু পারতপক্ষে তাকে জ্বালাতন করতে ছাড়তুম না। আমার পাগলামীর ভয়ে সে বেচারী আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতে পারত না, কিন্তু দরজার ফাঁক দিয়ে সে যে আমার পানে তার পটলচেরা চোখ দুটীর ভাসা ভাসা করুণ দৃষ্টি দিয়ে হাজার বার চেয়ে দেখ্‌ত,

তা আমি স্পষ্টই বুঝতে পারতুম, আর গুণ গুণ স্বরে গান ধরে দিতুম—

"সে যে করুণা জাগায় সকরুণ নয়ানে,
কেন, কি বলিতে চায়, না বলিয়া যায় সে।"

ক্রমে আমারও ভালবাসা এই ছেলেমির মধ্যে দিয়ে এক আধটু করে' বেরিয়ে পড়তে লাগ্‌ল। তারপর পরীক্ষা নিকট দেখে শুভাকাঙ্ক্ষী পিতা আমার আর বাড়ীতে থাকা নিরাপদ বিবেচনা করলেন না। আমি চলে' আসার দিনে আর জ্যাঠামি দিয়ে হৃদয় লুকিয়ে রাখতে পারিনি। হাস্‌তে গিয়ে অশ্রুজলে গণ্ডস্থল প্লাবিত করেছিলুম। সজল নয়নে তার হাত দুটী ধ'রে ব'লেছিলুম "আমার সকল দুষ্টোমি ক্ষমা করো লক্ষ্মীটি, আমায় মনে রেখো"। সে মুখ যুটে কিছু বল্‌তে পারলে না, কিন্তু তার ঐ চোখের জলই যে বলে দিলে সে আমায় কত ভালবেসে ফেলেছে। আমি ছেড়ে দেবার পর সে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে' অব্যক্ত স্বরে কাঁদ্‌তে লাগল। আমি চোখে রুমাল চেপে কোন রকমে নিজের দুর্ব্বলতাকে সম্বরণ করে ফেল্‌লুম। কে জানত, আমার সেই প্রথম সম্ভাষণই শেষ বিদায়-সম্ভাষণ—আমার সেই প্রথম চুম্বনই শেষ চুম্বন! কারণ, আর তা'কে দেখ্‌তে পাইনি। আমি চলে' আসবার মাস দুই পরেই পিত্রালয়ে সে আমায় চিরজনমের মত কাঁদিয়ে চলে' যায়। প্রথম যখন সংবাদটা পেলুম, তখন আমার কিছুতেই বিশ্বাস হ'ল না। এত বড় দুঃখ দিয়ে সে আমার চলে' যাবে? আমার এই আহত প্রাণ চীৎকার ক'রে কাঁদতে লাগল, 'না গো না, সে মরতেই পারে না! স্বামীকে না জানিয়ে সে এমন ক'রে চলে' যেতেই পারে না। সব শত্রু হ'য়ে তোমার বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা

জানিয়েছে।'   আমি পাগলের মত রাবেয়াদের বাড়ী গিয়ে হাজির হলুম। আমায় দেখে তা'দের পুরাণো শোক আবার নূতন করে' জেগে উঠল। বাড়ীময় এক উচ্চ ক্রন্দনের হাহাকার রোল আমার হৃদয়ে বজ্রের মত এসে বাজ্‌ল। আমি মূচ্ছিত হ'য়ে পড়্‌লুম।—ওগো, আর তা'র মৌন অশ্রুজল আমার পাষাণ বক্ষ সিক্ত করবে না? একটি কথাও যে বল্‌তে পারেনি সে! সে যাবে না, কখনও যাবে না, না। "হায় অভিমানিনি! ফিরে এস! ফিরে এস!"

সে এল না, যখন নিঝুম রাত্তির, কেউ জেগে নেই কেবল একটা 'ফেরু' ফেউ ফেউ চীৎকার করে' আমার বক্ষের স্পন্দন দ্রুততর ক'রে তুলছিল, তখন একবার তার গোরের উপর গিয়ে উপুড় হয়ে পড়লুম,— "রাবেয়া! প্রিয়তমে! একবার উঠ আমি এসেছি, সকল দুষ্টোমি ছেড়ে এসেছি। আমার সারাবক্ষ জুড়ে যে তোমারই আলেখ্য আঁকা তাই দেখতে এই নিভৃত গোরস্থানে নীরব যামিনীতে একা এসেছি। ওঠ, অভিমানিনি রাবেয়া আমার, কেউ দেখ্‌বে না, কেউ জান্‌বে না।" কবর ধ'রে সমস্ত রাত্তির কাঁদলুম, রাবেয়া এল না। আমার চারিদিকে একটা ঘূর্ণিবায়ূ হুহু করে কেঁদে ফির্‌তে লাগল, ছোট্ট শিউলী গাছ থেকে শিশিরসিক্ত ফুলগুলো আমার মাথায় ঝরে পড়্‌তে লাগল। ও আমার রাবেয়ার অশ্রুবিন্দু, না কারুর সান্ত্বনা? দু' একটা ধসে-যাওয়া কবরে দপ্‌ দপ্‌ করে আলেয়ার আলো জ্বলে উঠ্‌তে লাগল। আমি শিউরে উঠলুম। তখন ভোর হয়ে গেছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সর্ব্বাঙ্গে তার কবরের মাটী মেখে আবার ছুটে এলুম বর্দ্ধমানে। হায়, সে ত চলে গেল, কিন্তু আমার প্রাণে স্মৃতির যে আগুন জ্বেলে গেল সে ত আর নিবল না। সে আগুন যে ক্রমেই বেড়ে চলেছে, আমার বুক যে পুড়ে

ছারখার হয়ে গেল। এই প্রাণ-পোড়ানো স্মৃতির আগুন ছাড়া একটা কোন নিদর্শন যে সে রেখে যায় নি, যা'তে করে, আমার প্রাণে এতটুকু সান্ত্বনা পেতুম।

সেই যে আঘাত পেলুম, তাতেই আমার বুকের পাঁজর ভেঙ্গে চূর্ণ করে' দিল। আমি আর উঠ্‌তে পারলুম না।

(ঘ)

"দিন যায়, থাকে না। আমারও নীরস দিন গুলো কেটে যেতে লাগল কোন রকমে। ক্রমে ফার্ষ্টক্লাশে উঠলুম। তখন অনেকটা শুধ্‌রেছি। ইতিমধ্যে বর্দ্ধমান "নিউ স্কুল" উঠে যাওয়ায়, তা ছাড়া অন্য জায়গায় গেলে কতকটা প্রকৃতিস্থ হতে পারব আশায়, আমি রাণীগঞ্জে এসে পড়্‌তে লাগলুম। আমাদের ভূতপূর্ব্ব হেড মাষ্টার রাণীগঞ্জের সিয়ারসোল্‌ রাজ স্কুলের হেড মাষ্টারি পদ পেয়েছিলেন। তাঁর পুরাণো ছাত্র বলে' তিনি আমায় স্নেহের চক্ষে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন, আমিও পড়া লেখায় একটু মন দিলুম। কিন্তু ইতিমধ্যে আর একটা বিভ্রাট বেধে গেল, আমার আবার বিয়ে হয়ে গেল! তুমি, শুনে আশ্চর্য্য হবে, আমি এ বিয়েতে কোন ওজর আপত্তি করিনি। তখন আমার মধ্যে সে উৎসাহ, সে একগুঁয়েমি আর ছিল না। রাবেয়ার মৃত্যুর সঙ্গে আমি যেন একেবারেই পরনির্ভরশীল বালকের মত হয়ে পড়্‌লুম। যে যা বল্‌ত তাতে উদাসীনের মত 'হঁা' বলে' দিতুম। কোন জিনিষ তলিয়ে বুঝবার বা নিজের স্বাধীন মত প্রকাশ করবার ক্ষমতা যেন তখন আমার আদৌ ছিল না। আমার পাগলামি, হাসি

সব শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। এই সব দেখেই বোধ হয় মা আমার আবার বে' দেবার জন্যে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। তা ছাড়া আমি আরও ভেবেছিলুম হয়ত এই নবোঢ়ার মধ্যেই আমার রাবেয়াকে ফিরে পা'ব, আর তা'র স্নেহকোমল স্পর্শ হয়ত আমার বুকের দারুণ শোক যন্ত্রণার মধ্যে শান্তি আন্‌তে পারবে। কিন্তু হায়! যার জীবন চিরকালই এই রকম বিষাদময় হ'বে ব'লে বিধাতার মন্তব্য বহিতে লিখিত হ'য়ে গেছে, তার 'সবর' ও 'শোকর' ভি 'নান্যগতি'। তার কপাল চিরদিনই পড়বে। নববধূ সখিনা দেখতে শুন্‌তে মন্দ নয়, তাই বলে ডানাকাটা পরীও নয়; আর আমার নিজের চেহারার গুণ বিচার না করে' ওরকম একটি পরীর কামনা করাও অন্যায় ও ধৃষ্টতা। গুণও আমার তুলনায় অনেক বেশী, সে সব বিষয়ে কোথাও খুঁৎ ছিল না। আজকালকার ছোকরারা নিতান্ত বেহায়ার মত নিজে বৌ পছন্দ ক'রে আনেন। নিজের শরীর যে আবলুস কাঠের চেয়েও কাল বা কেঁদ কাঠের চেয়েও এবড়ো খেবড়ো সে দিকে দৃষ্টি নেই, কিন্তু বৌটির হওয়া চাই দস্তুর মত দুধে আলতার রং, হরিণের মত নয়ন, অন্ততঃ পটলচেরা ত চাই ই, সিংহের মত কটিদেশ, চাঁদের মত মুখ, কোকিলের মত কণ্ঠস্বর, রাজহংসীর মত গমন; রাতুল চরণ কমল, কারণ মানভঞ্জনের সময় যদি' 'দেহি পদবল্লবম্' উদারম্' বলে' তাঁর চরণ ধরে' ধন্না দিতে হয়, আর সেই যে চরণ যদি God forbid (খোদা না করেন) গদাধরের পিসীর ঠ্যাংএর মতই শক্ত কাঠপারা হয়, তাহ'লে বেচারা একটা আরাম পাওয়া হ'তে যে বঞ্চিত হয়' আর বেজায় রসভঙ্গও হয়। তৎসঙ্গে আরও কত কি কবি প্রসিদ্ধির চিজবস্তু, সে সময় আমার আর এখন ইয়াদ নেই। এই সব বোকারা ভুলেও ভাবে না যে, মেয়েগুলো

নিতান্ত সতীলক্ষ্মী গোবেচারার জাত হলেও তাদের একটা পছন্দ আছে। তারাও ভাল বর পেতে চায়। আমরা যত সব পুরুষ মানুষ বেজায় স্বার্থপর বলে' তাদের কোন কষ্ট দেখেও দেখিনে। মেয়েদের "বুক ফাটে ত মুখ ফোটে না" ভাব আমি বিলকুল না পছন্দ করি। অন্ততঃ যার সঙ্গে সারা জীবনটা কাটাতে হবে, পরোক্ষেও যদি তার সম্বন্ধে বেচারীরা কিছু বলতে কইতে না পায়, তবে তাহাদের পোড়াকপালী নাম সার্থক হয়েছে বলতে হবে। থাক্, আমার মত চুনোপুঁটির এ সব ছেঁদো কথায় বিজ্ঞ সমাজ কেয়ার ত করবেনই না, অধিকন্তু হয়ত আমার মস্তক লোমশূন্য করে' তা'তে কোন বিশেষ পদার্থ ঢেলে দিয়ে তাঁদের সীমানার বাইরে তাড়িয়ে দিবেন। অতএব আমি নিজের কথাই বলে যাই।

নব পরিণীতা সখিনার এ সব গুণ থাকা সত্ত্বেও আমি তাকে ভালবাসতে পারলুম না। অনেক 'রিহার্স্যাল' দিলুম কিছুতেই কিছু হলো না। হৃদয় নিয়ে এ ছিনিমিনি খেলার অভিনয় যেন আর ভাল লাগ্ছিল না। তা ছাড়া তুমি ব'ল্লে হয় ত বিশ্বাস করবে না রাবেয়া যেন আমার হৃদয় জুড়ে রাণীর মত সিংহাসন পেতে বসেছিল সেখানে অন্য কারুর প্রবেশাধিকার ছিল না। একনিষ্ঠ প্রেমে মানুষকে একটা আত্মহারা যদি না করে' ফেল্তে তবে 'কায়েস' মজনু' হয়ে লায়লীর জন্য এমন করে বনে, পাহাড়ে ছুটে বেড়াত না, ফরহাদের ওরকম পরিণাম হ'ত না। সখিনা কত ব্যথা পাচ্ছে, বুঝতে পারতুম, কিন্তু হায় বুঝেও কিছু করতে পারতুম না। বিবাহিতা পত্নীর প্রতি কর্ত্তব্যের অবহেলা আমার বুকে কাঁটার মত বিধ্ছিল! মা ক্ষুণ্ণ হ'লেন, বোনেরা বউকেই দোষী সাব্যস্ত ক'রে, তামিল করতে লাগ্ল। কিন্তু

কোথায় কি ফাঁক র'য়ে গেল জানি না, কিছুতেই তার হৃদয়ের সঙ্গে আমার হৃদয়ের মিশ খেল না। সে কেঁদে মাটী ভিজিয়ে দিলে, তবু আমার মন ভিজ্‌ল না। অনুশোচনার ও বাক্যজ্বালার যন্ত্রণায় বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে এলুম। রাবেয়া আমার বুকে যে আঘাত করে গিয়েছিল, তাই সইতে পারছিলুম না, তার উপর—খোদা, একি করলুম নিতান্ত অর্ব্বাচীনের মত? এ হতভাগিনীর জীবন কেন আমার সঙ্গে এমন করে জড়িয়ে ফেললুম? অসহ্য এই বৃশ্চিক যন্ত্রণা কাঁটার ছুরির মত আমার আগেকার আঘাতটায় খোঁচা মারতে লাগ্‌ল। আমি পাগল হয়ে যাবার মত হলুম। এরই মধ্যে রাণীগঞ্জে এসে 'টেষ্ট্‌ একজামিনেশন দিলুম।' সমস্ত বছর হট্টগোলে কাটিয়েছি। পাশ করব কোত্থেকে? আগেকার সে চুরি বিদ্যায়ও প্রবৃত্তি ছিল না,—অর্থাৎ এখন সাফ বুঝতে পাচ্ছ যে, (টেস্‌টে এলাউ) হইনি, সুতরাং ওটা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। এই শুভসংবাদ বাবার কর্ণগোচর হ'বা মাত্র তিনি কিঞ্চিদধিক এক দিস্তা কাগজ খরচ ক'রে আমার বিচিত্র সম্ভাষণের উপসংহারে জানিয়ে দিলেন যে আমার মত কুপুত্তুরের লেখা পড়া ঐ খানেই খতম হবে তা' তিনি বহু পূর্ব্বেই আন্দাজ করে' রেখেছিলেন, —অনর্থক এক রাশ টাকা জলে ফেলে ছিলেন ইত্যাদি। আমার জানটা তেতবেরক্ত হয়ে উঠল। "দুত্তোর" বলে' দফ্‌তর গুটালুম পরে, যা মনে আস্‌তে লাগ্‌ল তাই ক'রতে লাগ্‌লুম। লোকে আমায় বহরমপুর যাবার জন্য বিনা ফি-তে যেচে উপদেশ দিতে লাগ্‌ল। আমি তাদের কথায় 'ড্যামকেয়ার' ক'রে দিনরাত বোঁ হয়ে রইলুম। দু' চার দিন সইতে সইতে শেষে একদিন বোর্ডিং সুপারিটেণ্ডেণ্ট্‌ মশাই শুভক্ষণে আমায় অর্দ্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় দিলেন। আমি ফের বর্দ্ধমানে

চলে এলুম। আমাদের ছত্রভঙ্গদলের ভূতপূর্ব্ব গুণ্ডাগণ আমায় সাদরে বরণ করে' নিল। পিতা সব শুনে আমায় ত্যজ্য পুত্র ক'রলেন। এক বৎসর পরে খবর এল, সখিনা আমায় নিষ্ঠুর উপহাস করে' অজানার রাজ্যে চলে গেছে। মরবার সময়ও নাকি হতভাগিনী আমার মত পাপিষ্ঠের চরণ ধূলোর জন্যে কেঁদেছে, আমার ছেঁড়া পুরাণো একটা ফটো বুকে ধ'রে মরেছে। ক্রমেই আমার রাস্তা ফর্সা হতে লাগ্‌ল। আরো ছয় মাস পরে মা-ও চলে গেলেন। আমি তখন অট্টহাসি হেসে বোতলের পর বোতল উড়া'তে লাগলুম। তারপর শুভক্ষণে পল্টনে এসে সেঁদিয়ে পড়লুম বোম কেদার নাথ বলে! আর এক গ্লাস জল দিতে পার ভাই?

মেহের-নেগার

মেহের-নেগার

(ক)

ঝিলম্।

বাঁশী বাজ্‌ছে আর এক বুক কান্না আমার গুম্‌রে উঠ্‌ছে! আমাদের ছাড়াছাড়ি হ'ল তখন, যখন বৈশাখের গুমোট্-ভরা উদাস-মদির সন্ধ্যায় বেদনাতুর পিলু—বারোঁয়া রাগিণীর ক্লান্ত কান্না হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বেরুচ্ছিল। আমাদের দুজনারই যে এক-বুক ক'রে ব্যাথা, তার অনেকটা প্রকাশ পাচ্ছিল ঐ সরল-বাঁশের বাঁশীর সুরে। উপুড়-হয়ে-পড়ে-থাকা সমস্ত স্তব্ধ ময়দানটার আশে পাশে পথ হারিয়ে গিয়ে তারই উদাস প্রতিধ্বনি ঘুরে মর্‌ছিল। দুষ্টু দয়িতকে খুঁজে খুঁজে বেচারা কোকিল যখন হয়রান পেরেশান্ হয়ে গিয়েছে আর অশান্ত অশ্রুগুলো আট্‌'কে রাখবার ব্যর্থ চেষ্টায় বারম্বার চোখ দুটোকে ঘ'সে ঘ'সে কলিজার মত রক্ত-লোহিত ক'রে ফেলেছে, তখন তরুণী কোয়েলিটা তার প্রণয়ীকে এই ব্যথা দেওয়ার বোধ হয় বাস্তবিকই ব্যথিত হয়ে উঠেছিল,—কেননা তখ্‌খনই কলামোচার আম গাছটার আগ্‌ডালে কচি আমের থোকার আড়ালে থেকে মুখ বাড়িয়ে সকৌতুকে সে কুক্ দিয়ে উঠ্‌ল 'কু—কু—কু।' বেচারা শ্রান্ত কোকিল তখন রুদ্ধকণ্ঠে তার এই পাওয়ার আনন্দটা জানতে আকুলি বিকুলি করে চেঁচিয়ে উঠল

কিন্তু ডেকে ডেকে তখন তার গলা বসে' গিয়েছে তবু অশোক গাছে থেকে ঐ ভাঙ্গা গলাতেই তার যে চাপ বেদনা আট্‌কে আট্‌কে যাচ্ছিল, তারই আঘাত খেয়ে সাঁজের বাতাস ঝিলম্ তীরের কাশের বনে মুহূর্মুহূঃ কাঁপন দিয়ে গেল।

আমি ডাক দিলুম, "মেহের-নেগার।" কাশের বনটা তার হাজার শুভ্রশীষ দুলিয়ে বিদ্রূপ কর্‌লে, "…আ…র্!" ঝিলমের ওপারের উঁচু চরে আহত হয়ে আমারই আহ্বানে কেঁদে ফেল্‌লে, আর সে রুদ্ধশ্বাসে ফিরে এসে এইটুকু বল্‌তে, পার্‌লে, "মেহের—নেই—আর!"

পশ্চিমে সূর্য্যের চিতা জ্বল্‌ল এবং নিবে এল। বাঁশীর কাঁদন থাম্‌লো। মলয়-মারুত পারুল বনে নাম্‌লো বড় বড় শ্বাস ফেলে! পারুল বল্‌লে, 'উ-হু'—মলয় বল্‌লে "আ—হ্—আঃ!"

আমি বুক ফুলিয়ে চুল দুলিয়ে মনটাকে খুব একচোট বকুনি দিয়ে আনন্দ-ভৈরবী আলাপ কর্‌তে কর্‌তে ফিরলুম—আমার মত অনেক হতভাগারাই ঐ ব্যথা-বিজড়িত চলার পথ ধরে। এমন সাধা গলাতেও আমার সুরটার কলতান শুধু হোঁচট্ খেয়ে খেয়ে লজ্জায় ম'রে যাচ্ছিল। আমার কিন্তু লজ্জা হচ্ছিল না। আমার বন্ধু তানপুরাটা কোলে করে তখন শ্রীরাগ ভাঁজছেন দেখ্‌লুম। তিনি হেসে বল্‌লেন, কি য়ূসোফ্।" এ আসন্ন সন্ধ্যা বুঝি তোমার আনন্দ-ভৈরবী আলাপের সময়? তুমি যে দেখ্‌ছি অপরূপ বিপরীত!" আমার তখন কান্না আস্‌ছিল। হেঁসে বল্‌লুম, "ভাই তোমার শ্রীরাগেরও ত সময় পেরিয়ে গেছে।" সে বল্‌লে "তাইত! কিন্তু তোমার হাসি আজ এত করুণ কেন,—ঠিক পাথর-খোদা মূর্ত্তির হাসির মত হিম-শীতল আর জমাট?" আমি উল্টো দিকে মুখ ফিরিয়ে খুব তাড়াতাড়ি চল্‌তে লাগ্‌লুম।

রিক্তের বেদন

আদরিণী অভিমানী বধূর মত সন্ধ্যা তার মুখটাকে ক্রমশই কালিপানা-আঁধার ক'রে তুল্‌ছিল। এমন সময় কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয় তিথির এক-আকাশ তারা তাকে ঘিরে বল্‌লে "সন্ধ্যারাণী। বলি এত মুখভার কিসের? এত ব্যস্ত হস্‌নে লো,—ঐ—চন্দ্রদেব এল বলে'!" অপ্রতিভ বেচারী সন্ধ্যার মুখে জোর করে' হাসার সলজ্জ-মলিন ঈষৎ আলো ফুটে' উঠ্‌ল। চাঁদ এল মদখোর মাতালের মত টল্‌তে টল্‌তে, চোখ মুখ লাল করে' এসেই সে জোর করে' সন্ধ্যাবধূর আবরু ঘোম্‌টা খুলে দিলে সন্ধ্যা হেসে ফেল্‌লে। লুকিয়ে-দেখা বৌঝির মত একটা পাখী বকুল গাছে থেকে লজ্জারাঙ্গা হয়ে টিট্‌কারী দিয়ে উঠ্‌ল, 'ছি—ছি!' তারপর চাঁদে আর সন্ধ্যায় অনেক ঝগড়াঝাটি হয়ে সন্ধ্যার চিবুক আর গাল বেয়ে খুব খানিক শিশির ঝরবার পর সে বেশ খুসি মনেই আবার হাসি-খেলা করতে লাগল। কতকগুলো বেহায়া তারা ছাড়া অধিকাংশকেই আর দেখা গেল না।

আমার বিজন কুটীরে ফিরে এলুম। চাঁদ উঠেছে, তাই আর প্রদীপ জাললুম না। আর, জ্বালালেও দীপশিখার ঐ ম্লান ধোঁয়ার রাশটা আমার ঘরের বুকভরা অন্ধকারকে একেবারে তাড়াতে পার্‌বে না। সে থাক্‌বে লুকিয়ে পাতার আড়ালে, ঘরের কোণে, সব জিনিষেরই আড়ালে; ছায়া হয়ে আমাকে মধ্যে রেখে ঘুর্‌বে আমারই চারিপাশে! চোখের পাতা পড়তে না পড়তে হড়্‌পা বানের মত হুপ্‌ ক'রে আবার সে এসে পড়বে—যেই একটু সরে যাবে এই দীপশিখাটা!—ওগো আমার অন্ধকার! আর তোমায় তাড়াব না।—আজ হ'তে তুমি আমার সাথী, আমার বন্ধু, আমার ভাই!—বুঝ্‌লে ভাই আঁধার, এই আলোটার পেছনে থাম্‌খা এতগুলো বছর ঘুরে মর্‌লুম!—

আমি বল্লুম, "ওগো মেহের-নেগার! আমার তোমাকে চাই-ই। নৈলে যে আমি বাঁচব না!—তুমি আমার। নৈলে এত লোকের মাঝে তোমাকে আমি নিতান্ত আপনার ব'লে চিন্লুম কি করে'?—তুমিই ত আমার স্বপ্নে পাওয়া সাথী!—তুমিই আমার, নিশ্চয়ই আমার!"—চল্তে চল্তে থম্‌কে দাঁড়িয়ে সে আমার পানে চাইলে, পলাশ ফুলের মত ডাগর টানাটানা কাজোল-কালো চোখ দুটির গভীর দৃষ্টি দিয়ে, আমার পানে চাইলে! কল্‌সিটি-কাঁখে ঐ পথের বাঁকেই অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে সে রইল। তারপর বল্‌লে, "আচ্ছা,—তুমি পাগল?"—আমি ঢোক গিলে, একরাশ অশ্রু ভিতর দিকে ঠেলে দিয়ে মাথা দুলিয়ে বল্লুম, "হুঁ।" তার আঁখির ঘনকৃষ্ণপল্লবগুলিতে আঁছু উথ্‌লে এল! তারপর সে তাড়াতাড়ি চলে যেতে যেতে বল্‌লে "আচ্ছা আমি তোমারই!"

একটা অসম্ভব আনন্দের জোর ধাক্কায় আমি অনেক্ষণ মুস্‌ড়ে পড়েছিলুম। চম্‌'কে উঠে চেয়ে দেখ্‌লুম সে পথের বাঁক ফিরে অনেক দূরে চ'লে যাচ্ছে।

আমি দৌড়ুতে দৌড়ুতে ডাক্‌লুম, "মেহের-নেগার!" সে উত্তর দিল না। কল্‌সিটাকে কাঁখে জড়িয়ে ধরে ডান হাতটাকে তেম্‌নি ঘন ঘন দুলিয়ে সে যাচ্ছিল। তারপর তাদের বাড়ীর সিঁড়িতে একটা পা থুয়ে আমার দিকে তিরস্কার-ভরা মলিন চাওয়া চেয়ে চলে গেল। আর বলে গেল, "ছি! পথে ঘাটে এমন ক'রে নাম ধরে ডেকো না!—কি মনে ক'রবে লোকে।" পথ না দেখে দৌড়ুতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে একবার পড়ে গেছিলুম, তা'তে আমার নাক দিয়ে তখনও ঝরঝর করে খুন ঝরছিল! আমি সেটা বাঁ-হাত দিয়ে লুকিয়ে বল্লুম, "আঃ, তাইত!—আর অমন ক'রে ডাক্‌ব না।"

বুঝ্‌লে সখা আঁধার! যে জন্মান্ধ, তার তত বেশী যাতনা নেই, যত বেশী যাতনা আর দুঃখ হয়—একটা আঘাত পেয়ে যার চোখ দুটো বন্ধ হ'য়ে যায়! কেন না জন্মান্ধ ত কখনও আলোক দেখেনি। কাজেই এ জিনিসটা সে বুঝতে পারে না আর যে জিনিস সে বুঝ্‌তে পারে না তা' নিয়ে তার তত মর্ম্মাহত হবারও কোন কারণ নেই। আর, এই একবার আলো দেখে' তারপর তা হ'তে বঞ্চিত হওয়া,—ওঃ কত বেশী নির্ম্মম নিদারুণ!

তোমায় ছেড়ে চ'লে যাওয়ার যে প্রতিশোধ নিলে তুমি, তা'তে ভাই আঁধার, আর যেন তোমায় ছেড়ে না যাই! তোমায় ছোট ভেবে এই যে দাগা পেলাম বুকে ওঃ তা,—

সেদিন ভোরে ঝিলম্ নদীর কূলে তার সঙ্গে আবার দেখা হ'ল। সে আস্‌ছিল একা নদীতে স্নান করে'। কালো কশকশে' ভেজা চুলগুলো আর ফিরোজা রঙের পাৎলা উড়ানিটা ব্যাকুল আবেগে তার দেহ-লতাকে জড়িয়ে ধরেছিল। আকুল কেশের মাঝে সদ্যঃস্নাত সুন্দর মুখটি তার দীঘির কালোজলে টাট্‌কা ফোটা পদ্মফুলের মত দেখাচ্ছিল। দূরে একটা জলপাই গাছের তলায় বসে সরল রাখাল বালক গাচ্ছিল,—

গৌরী ধীরে চলো, গাগরি ছলক নাহি যায়—
শিরোপরি গাগরি, কোমর মে ঘড়া,
পাৎরি মকরিয়া তেরি বলখ না যায়, আহা টুটু না যায়;—
গৌরী ধীরে চলো!"

আমিও সেই গানের প্রতিধ্বনি তুলে' বল্লুম, "ওগো গৌরবর্ণা কিশোরি, একটু ধীরে চল,—ধীরে—তোমার ভরা কুম্ভ হ'তে জল ছল্‌কে পড়্‌বে যে। অত সূক্ষ্ম তোমার কটিদেশ ভরা গাগরি আর ঘড়ার ভারে মুচ্‌কে

ভেঙ্গে যাবে যে! ওগো তন্বী গৌরী, ধীরে একটু ধীরে চল!" আমায় দেখে তার কাণের গোড়াটা সিঁন্দুরের মত লাল হয়ে উঠ্‌ল। আমার দিকে সরম-অনুযোগভরা কটাক্ষ হেনে সে বল্‌লে, "ছি ছি সরে' যাও। একি পাগ্‌লামি কর্‌ছ?"—আমি ব্যথিত কণ্ঠে ডাকলুম, "মেহের-নেগার!" সে একবার আমার রুক্ষ কেশ, ব্যথাতুর মুখ, ধূলিলিপ্ত দেহ আর ছিন্ন মলিন বসন দেখে কি মনে করে' চুপটি করে' দাঁড়াল। তারপর ম্লান হেসে বল্‌লে "ও হোলো! আমার নাম 'মেহের-নেগার' কে বল্‌লে?—আচ্ছা, তুমি আমায় ও নামে ডাক কেন! সে তোমার কে?" আমি দেখলুম, কি একটা ভীতি আর বিস্ময় তার স্বরটাকে ভেঙ্গে টুক্‌রো টুক্‌রো করে' দিয়ে গেল! তার শঙ্কাকুল বুকে ঘন-স্পন্দন মূর্ত্ত হয়ে ফুট্‌ল! আমারও মনে অমনি বিস্ময় ঘনিয়ে এল। দৃষ্টি ক্রমেই ঝাপ্‌সা হয়ে আসছিল, তাই তার গায়ে হেলান দিয়ে বললুম, "আহ্‌! তুমি তবে সে নও? না—না, তুমিইত সেই আমার—আমার মেহের-নেগার! অমনি হুবহু মুখ, চোখ,—অমনি ভুরু, অমনি চাউনি, অমনি কথা!—না গো না, আর আমায় প্রতারণা করো না। তুমি সেই! তুমি—"। সে বললে, "আচ্ছা মেহের-নেগারকে কোথায় দেখেছিলে?" আমি বললুম, "কেন, 'খোওয়াবে'!" তার মুখটা এক নিমেষে যেন দপ করে জ্বলে উঠ্‌ল। তার সাদা মুখে আবার রক্ত দেখা গেল। সে ঝর্‌ণার মত ঝরঝর করে' হাঁসির ঝরা ঝরিয়ে বল্‌লে, "আচ্ছা, তুমি কবি না চিত্রকর?" আমি অপ্রতিভ হয়ে বললুম, "চিত্র ভালবাসি, তবে চিত্রকর নই। আমি কবিতাও লিখি, কিন্তু কবি নই।" সে এবার হেঁসে যেন লুটোপুটি খেতে লাগ্‌ল।

আমি বল্‌লুম, "দেখ তুমি বড্ড দুষ্টু!" সে বল্‌লে, "আচ্ছা আমি আর হাঁসব না!—তুমি কিসের কবিতা লেখ?" আমি বল্‌লুম, "ভালবাসার!" সে ভিজা কাপড়ের একটা কোণ নিঙ্‌ড়াতে নিঙ্‌ড়াতে বল্‌লে, "ও তাই,—তা কাকে উদ্দেশ ক'রে?" আমি সেইখানেই সবুজ ঘাসে বসে পড়ে বল্‌লুম, "তোমাকে—মেহার-নেগার! তোমাকে উদ্দেশ করে।" আবার তার মুখে যেন কে এক থাবা আবীর ছড়িয়ে দিলে! সে কল্‌সিটা কাঁখে আর একবার সামলে নিয়ে বল্‌লে, "তুমি কদ্দিন হতে এ রকম কবিতা লিখ্‌ছ?" আমি বল্‌লুম "যেদিন হতে তোমায় খোওয়াবে দেখেছি।" সে বিস্ময়-পুলকিত নেত্রে আমার দিকে একবার চাইলে, তারপর বল্‌লে, "তুমি এখানে কি কর?" আমি বল্‌লুম "খাঁ সাহেবের কাছে।" সে খুব উৎসাহের সঙ্গে বল্‌লে "একদিন তোমার গান শুন্‌বখন।—শুনাবে?" তারপর চলে যেতে যেতে পিছন ফিরে বল্‌লে, "আচ্ছা তোমার ঘর কোন্ খানে?" আমি বল্‌লুম, "ওয়াজিরিস্থানের পাহাড়।" সে অবাক্ বিস্ময়ে ডাগর চক্ষু দিয়ে অনেকক্ষণ আমার দিকে চাইলে তারপর স্নিগ্ধকণ্ঠে বল্‌লে, "তুমি তাহলে এদেশের নও? এখানে নূতন এসেছ?"—আমি তার চোখে চোখে রেখে বল্‌লুম, "হুঁ আমি পরদেশী।"·····সে চুপি চুপি চলে গেল, আর একটিও কথা কইলে না।···আমার গলায় তখন বড্ডো বেদনা, কে যেন টুঁটি চেপে ধরেছিল। পেছন হতে ঘাসের শ্যামল বুকে লুটিয়ে পড়ে, আবার ডাকলুম তাকে। কাঁখের কল্‌সি তার টিপ করে পড়ে ভেঙ্গে গেল। সে আমার দিকে একটা আর্ত্তদৃষ্টি হেনে বল্‌লে, "আর ডেকোনা অমন করে!" দেখলুম তার দুই কপোল দিয়ে বেয়ে চলেছে দুইটি দীর্ঘ অশ্রু-রেখা!

* * * *

প্রাণপণে চেষ্টা করেও সেদিন সুরবাহারটার সুর বাঁধতে পারলুম না। আদুরে মেয়ের জেদ-নেওয়ার মত তার ঝঙ্কারে শুধু একরোখা বেখাপ্পা কান্না হুঁকরে উঠছিল। আমার হাতে আমার এই প্রিয় যন্ত্রটি আর কখনও এরূপ অশান্ত অবাধ্য হয়নি, এমন একজিদে কান্নাও কাঁদেনি। আদর আবদার দিয়ে অনেক করেও মেয়ের কান্না থামাতে না পার্‌লে মা যেমন সেই কাঁদুনে মেয়ের গালে আরও দুতিন থাপ্পড় বসিয়ে দেয়, আমিও তেমনি করে সুরবাহারের তারগুলোতে অত্যাচারীর মত হাত চালাতে লাগলুম। সে নানান্ রকমের মিশ্রসুরে গোঙানি আরম্ভ করে দিলে! ওস্তাদজি আঙ্গুরগালা মদিরার প্রসাদে খুব খোশ মেজাজে ঘোর দৃষ্টিতে আমার কাণ্ড দেখ্‌ছিলেন। শেষে হাঁসতে হাঁসতে বল্‌লেন, "কি বাচ্চা, তোর তবিয়ত আজ ঠিক নেই,—না? মনের তার ঠিক না থাক্‌লে বীণার তারও ঠিক থাকে না। মন যদি তোর বেসুরা বাজে, তবে যন্ত্রও বেসুরা বাজবে, এ হচ্ছে খুব সাচ্চা আর সহজ কথা।—দে আমি সুর বেঁধে দিই!', ওস্তাদজী বেয়াদব সুরবাহারটার কাণ ধরে বার কতক মোলায়েম ধরণের কাণ্‌টি দিতেই সে শান্তশিষ্ট ছেলের মত দিব্যি সুরে এল। সেটা আমার হাতে দিয়ে, সাম্‌নের প্লেট্ হ'তে দুটো গরম গরম সিক কাবাব ছুরি দিয়ে ছাড়াতে ছাড়াতে তিনি বল্‌লেন "আচ্ছা একবার বাগেশ্রী রাগিণীটা আলাপ কর্ ত বাচ্চা হাঁ,—আর ও সুরটা ভাঁজবারও সময় হয়ে এসেছে। এখন কত রাত হবে? হাঁ, আর দেখ্ বাচ্চা, তুই গলায় আর একটু গমক খেলাতে চেষ্টা কর, তাহলেই সুন্দর হবে।" কিন্তু সেদিন যেন কণ্ঠভরা বেদনা! সুরকে আমার গোর দিয়ে এসেছিলুম ঐ ঝিলম্ দরিয়ার তীরের বালুকার

তলে। তাই কণ্ঠে যখন অতিতারের কোমল গান্ধারে উঠ্‌লুম তখন আমার কণ্ঠ যেন দীর্ণ হয়ে গেল তার তা ফেটে বেরুল শুধু কণ্ঠভরা কান্না। ওস্তাদজী দ্রাক্ষারসের নেশায় "চড়্‌ বাচ্চা আর দু'পরদা পঞ্চমে—" বল্‌তে বল্‌তে হঠাৎ থেমে গিয়ে সান্ত্বনাভরা স্বরে কইলেন, "কি হয়েছে আজ তোর বাচ্চা? দে আমায় ওটা।" বাগেশ্রীর ফেঁপিয়ে ফেঁপিয়ে-কান্না ওস্তাদ্‌জীর গভীর কণ্ঠ সঞ্চরণ কর্‌তে লাগল অনুলোমে বিলোমে —সাধা গলার গমকে মীড়ে! তিনি গাইলেন, "বীণা-বাদিনীর বীণ আজ আর রোয়ে রোয়ে বনের বুকে মুহুর্মুহুঃ স্পন্দন জাগিয়ে তুল্‌ছে না। আঁছু এসে তার কণ্ঠ চেপে ধরেছে। তাই পূর্ণ হয়ে বেরোচ্ছে না ওগো, তার যে খাদের আর অতিতার দুইটি তার ছিন্ন হযে গেছে?" আমার তখন ওদিকে মন ছিল না। আমার মন পড়ে ছিল সেই আমার স্বপ্নে-পাওয়া তরুণীটির কাছে।

ওঃ, সে স্বপ্নের চিন্তাটা এত বেশী তীব্র মধুর, তাতে এত বেশী মিঠা উন্মাদনা যে দিনে হাজার বার মনে করেও আমার আর তৃপ্তি হচ্ছে না। সে কি অতৃপ্তির কণ্টক বিঁধে গেল আমার মর্ম্মতলে, ওগো আমার স্বপ্ন-দেবী! ওই কাঁটা যে হৃদয়ে বিঁধেছে, সেইটেই এখন পেকে সারাবুক বেদনায় টন্‌টন্‌ করছে! ওগো আমার স্বপ্নলোকের ঘুমের দেশের রাণী! তোমার সে আকাশ-ঘেঁসা ফুল, আর পরাগ-পরিমলে ভরা দেশ কোথায়? সে জ্যোৎস্না-দীপ্ত কুটীর যেখানে পায়ের আলতা তোমার রক্ত রাগে পাতার বুকে ছোপ দিয়ে যায়,—সে কুটীর কোন্‌ নিকুঞ্জের আড়ালে, কোন্‌ তড়াগের তরঙ্গ-মর্ম্মরিত তীরে।

সে স্বপ্নচিত্রটা কি সুন্দর!—

সেদিন সাঁজে অনেকক্ষণ কুস্তি করে খুব ক্লান্ত হয়ে যেম্‌নি বিছানায়

গা দিয়েছি, অম্‌নি যেন রাজ্যের ঘুম এসে, আমার সারা দেহটাকে নিষ্কম্প অলস করে ফেল্‌লে,—আমার চোখের পাতায় তার সোহাগ-ভরা ছোঁয়ার আবেশ দিয়ে। শীঘ্রই আমার চেতনা লুপ্ত করে' দিলে সে যেন কার শিউরে' উঠা কোমল অধরের উন্মাদনা-ভরা চুম্বন-মদিরা।...... হঠাৎ আমি চম্‌কে উঠ্‌লুম!......কে এসে আমার দুইটি চোখেই স্নিগ্ধ কাজোল বুলিয়ে দিলে! দেখলুম যেখানে আস্‌মান আর দরিয়া চুমোচুমি কর্‌ছে, সেইখানে একটি কিশোরী বীণা বাজাচ্ছে; বরফের ওপর পূর্ণচাঁদের চাঁদনি পড়্‌লে যেমন সুন্দর দেখায়, তাকে তেমনি দেখাচ্ছিল, সূক্ষ্ম রেশমী নীল পেশোয়াজের শাসন টুটে বীণাবাদিনীর কৈশোর মাধুর্য্য ফুটে বেরুচ্ছিল—আস্‌মানের গোলাবি-নীলিমায় জড়িত প্রভাত অরুণশ্রীর মত মহিমশ্রী হয়ে। সে আমায় হাতছানি দিয়ে ডাক্‌লে। আমার চোখে ঘুমের রঙিন্ কুয়াসা মস্‌লিনের মত একটা ফিন্‌ফিনে পরদা টেনে দিলে। বীণার চেয়েও মধুর বীণাবাদিনীর মঞ্জু গুঞ্জন প্রেয়সীর কাণে-কাণে-কওয়া গোপন কথার মত আমায় কয়ে গেল, "ঐ যে চাঁদের আলোয় ঝিলমিল্ কর্‌ছে দরিয়ার কিনার ঐখানে আমার ঘর। ঐখানে আমি বীণা বাজাই। তোমার ঐ সরল বাঁশীর সহজ সুর আমার বুকে বেদনার মত বেজেছে, তাই এসেছি! আবার আমাদের দেখা হবে সূর্য্যাস্তের বিদায়-ম্লান শেষ আলোক-তলে। আর মিলন হবে এই উদার আকাশের কোলে এম্‌নি এক অরুণ-অরুণিমা-রক্ত নিশি-ভোরে—যখন বিদায় বাঁশীর ললিত বিভাসের কান্না তরল হয়ে ঝ'রে পড়বে।" আমি আবিষ্টের মত তার আঁচল ধ'রে জিজ্ঞাসা করলুম, "কে তুমি স্বপ্নরাণী?" সে বল্লে, "আমায় চিনতে পার্‌লে না য়ূসোফ? আমি তোমারই মেহের-নেগার।"...অচিন্ত্য অপূর্ব্ব অনেক কিছু

পাওয়ার আনন্দে আমার বুক ভরে' উঠেছিল। আমি রুদ্ধকণ্ঠে কইলুম "তুমি আমায় কি করে' চিন্‌লে?—হাঁ, আমি তোমাকেই চাইছিলুম— তবে তোমার নাম জানতুম না। আর তোমায় নাকি অনেকেই জীবনের এমনি ফাগুন-দিনে ডাকে? তবে শুধু কি আমায়ই দেখা দিলে, আর কাউকে না?" সে তার তাম্বুলরাগ-রক্ত পাপড়ির মত পাংলা ঠোঁট উল্‌টিয়ে বললে, "না—আমি তোমায় কি ক'রে চিন্‌ব?— এই হাল্‌কা হাওয়ায় ভেসে আমি সব জায়গাতেই বেড়াই; কাল সাঝে তাই এদিক দিয়ে পেরিয়ে যেতে যেতে শুনলুম তুমি আমায় বাঁশীর সুরে কামনা কর্‌ছ! তাই তোমায় দেখা দিলুম···আর, হাঁ—যারা তোমার মত এম্‌নি বয়সে এম্‌নি করে' তাদের অজানা অচেনা প্রেয়সীর জন্য কেঁদে মরে, কেবল তাকেই দেখা দিয়ে যাই।···তবু আমি তোমারই!"··· মেঘের কোলে সে কিশোরীর কম-মূর্ত্তি ঝাপসা হয়ে এল।

[আমার ঘুম ভাঙ্‌ল। কোকিল ডাকলে, 'উ—হু—উ!' পাপিয়া শুধালে, 'পিউ কাঁহা?' বুলবুল ঝুঁটি দুলিয়ে গলা ফুলিয়ে বললে, 'জা—নি—নে!' ঝরা-হেনার শেষ সুবাস আর পীত-পরাগ-লিপ্ত ভোরের বাতাস আমার কাণের কাছে শ্বাস ফেলে গেল, 'হু—হু·· হু!'

(গ)

আমার স্নেহের বাঁধনগুলো জোর বাতাসে পালের দীর্ণ দড়ির মত পট্‌পট্‌ করে ছিঁড়ে গেল। তারপর ঢেউএর মুখে ভাস্‌তে ভাস্‌তে খাপছাড়া—ঘরছাড়া আমি এই ঝিলমে এলুম!—প্রথম দেখলুম এই হিন্দুস্থানের বীরের দেশ পাঁচটা দরিয়ার তরঙ্গ-সঙ্কুল পাঞ্জাব, যেখানের

প্রতি বালুকণা বীরের বুকের রক্ত জড়ানো—যেখানের লোকের তৃষ্ণা মিটাত দেশদ্রোহী আর—দেশ-শত্রু 'জিগরের খুন'।

*   *   *   *

যে ডাল ধরতে গেলুম, তাই ভেঙ্গে আমার মাথায় পড়্ল। তাই নিরাশ্রয়ের কুটোধরার মত অকেজোর কাজ এই সঙ্গীতকেই আশ্রয় করলুম আমার কাজ আর সান্তনারূপে।

ওঃ আমার এই বলিষ্ঠ মাংসপেশী-বহুল শরীর, মায়ামমতাহীন—লৌহ কবাটের মত শক্ত বক্ষঃ, তাকে আমি চেষ্টা করেও উপযুক্ত ভাল কাজে লাগাতে পারলুম না খোদা! দেশের মঙ্গলের জন্য এর ক্ষয় হ'ল না!—প্রিয় ওয়াজিরিস্থানের পাহাড় আমার! তোমার দেহটাকে অক্ষত রাখতে গিয়ে যদি আমার এই বুকের উপর তোমার অনেকগুলো পাথর পড়ে' পাঁজরগুলো গুঁড়ো করে' দিত, তা'হলে সে কত সুখের মরণ হ'ত আমার! ওই ত-হ'ত আমার হতভাগ্য জীবনে শ্রেষ্ঠ সার্থকতা—আমার জন্যে কেউ কাঁদবার নেই বলে হয়ত তাতে মানুষ কেউ কাঁদত না, কিন্তু তোমার পাথরে—মরুতে—উষ্ণমারুতে—শুক্‌নো শাখায় একটা আকুল অব্যক্ত কম্পন উঠত! সেইত দিত আত্মায় আমার পূর্ণ তৃপ্তি! আহ, এমন দিন কি আস্‌বে না জীবনে!

আচ্ছা—ওগো অলক্ষ্যের মহান স্রষ্টা! তোমার সৃষ্ট পদার্থে এত মধুর জটীলতা কেন? পাহাড়ের পাথরবুকে নির্ঝরের স্রোত বইয়েছ, আর আমাদের মত পাষাণের বুকেও প্রেমের ক্ষীণ ফল্গুধারা লুকিয়ে রেখেছ!......আর তুমি যদি ভালোবাসাই সৃষ্টি কর্‌লে, তবে আলোর নিচের ছায়ার মত তার আড়ালে নিরাশাকে সঙ্গোপন রাখলে কেন?

আমাকে সব চেয়ে ব্যথিয়ে তুল্‌ছে গত সন্ধ্যার কথাটা!—

আবার সহসা তার সঙ্গে দেখা হ'ল সন্ধ্যেবেলার খানিক আগে। তখন ঝিলমের তীরে তীরে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ঝিঁঝিঁট রাগিণীর ঝম্ ঝমানি ভ'রে উঠেছিল। সে ঠিক সেই স্বপ্নে দেখা কিশোরীর মতই হাত-ছানি দিয়ে আমায় ডাক্‌লে, "এখানে এস!"···আমি শুধোলুম' "মেহের নেগার, স্বপ্নের কথা কি সত্যি হয়?" সে বল্‌লে, "কেন?" আমি তাকে আমার সেই স্বপ্নের কথা জানিয়ে বল্‌লুম,"তুমিইত সেদিন নিশি-ভোরে আমায় অমন করে' দেখা দিয়ে এসেছিলে আর তোমার নামও বলে এসেছিলে। তুমি যে আমার!" একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বয়ে' গেল তার বুকের বসনে দোল দিয়ে! সে বল্‌লে, "য়ূসোফ, আমি ত মেহের-নেগার নই, আমি—গুল্‌শন্!" সে কেঁদে ফেল্‌লে।···আমি বল্‌লুম, "তা হোক্, তুমিই সেই। আমি তোমাকে মেহের-নেগার বলেই ডাক্‌ব!"····সে বললে, "এস, সেদিন গান শুনাবে বলেছিলে না?" আমি বল্‌লুম, "তুমিই গাও, আমি শুনি।" সে গাইলে,—

"ফারাকে জাঁনা মে হাম্‌নে সাকি লোহু পিয়া হেয় শারাব
করকে!
তপে আলম নে জেগর্ কো ভূনা উয়ো হাম্‌নে খায়া কবাব
কর্‌কে॥"

আহ্! এ কোন্ দগ্ধ হৃদয়ের ছট্‌ফটানি?—প্রিয়তমের বিচ্ছেদে আমার নিজের খুনকেই শারাবের মত ক'রে পান করেছি, আর ব্যথার তাপে আমার হৃদপিণ্ডটাকে পুড়িয়ে কাবাব ক'রে খেয়েছি!—ওগো সাকি, আর কেন? এস্‌রাজের ঝঙ্কার থামাতে অনেক সময় লাগল।

আমি গাইলুম, "ওগো, সে যদি আমার কথা শুধায়, তবে বলো যে, সারাজনম অপেক্ষা ক'রে ক'রে ক্লান্ত হয়ে সে আজ বেহেশ্‌তের বাইরে

তোমারই প্রতীক্ষায় ব'সে আছে!" সে কেঁদে, আমার মুখটা চেপে ধরে' বললে, "না—না, এমন গান গাইতে নেই!" তারপর বল্লে, "আচ্ছা, এই গান বাজনায় তোমার খুব আনন্দ হয়,—না?" আবার সে কোন্ অজানা-নিষ্ঠুরের প্রতি অভিমানে আমার বক্ষে ক্রন্দন গুম্‌রে উঠল! আমি গাইলুম—

"শান্তি কোথায় মোর তরে হায় বিশ্বভুবন মাঝে?
অশান্তি যে আঘাত করে তাইতে বীণা বাজে!
নিত্য রবে প্রাণ-পোড়ানো গানের আগুন জ্বালা,
এই কি তোমার খুসী, আমায় তাই পরালে মালা
স্বরের গন্ধ ঢালা?"

বিদায়ের ক্ষণে সে হাঁসতে গিয়ে কেঁদে ফেলে' বললে, "আচ্ছা, তুমি আমায় ভালোবাস, তাই আমি একটা ভিক্ষা চাইছি।... বল, আর আমায় ভালোবাসবে না, আমায় চাইবে না।" সে উপুর হ'য়ে আমার পায়ে পড়ল!...চাঁদের সমস্ত আলো এক লহমায় নিবে গেল বিরাট একটা জলোমেঘের কালো ছায়ার আড়ালে পড়ে'!...আমি কষ্টে উচ্চারণ করতে পারলুম, "কেন?" সে একটু থেমে', চোখদুটো আঁচল দিয়ে চেপে বল্লে, "দেখ পবিত্র জিনিসের পূজা পবিত্র জিনিস দিয়েই হয়। কলুষ যা', তা' দিয়ে পূতকে পেতে গেলে পূজারীর পাপের মাত্রা চরমে গিয়ে পৌছে!......এই যে তোমার ভালোবাসা,—হোক্‌না তা' মাদকতা আর উন্মাদনার তীব্রতায় ভরা,—তা' অকৃত্রিম আর প্রগাঢ়-পবিত্র! তা'কে অবমাননা করতে আমার যে একবিন্দু সামর্থ্য নেই!... আমাকে চেন না? এই সহরে যে খুরশেদজান বাইজির নাম শুন, আমি তরই মেয়ে।" বলেই সে সোজা হ'য়ে দাঁড়াল, তার সারা অঙ্গ

কাঁপ্‌তে লাগল। সে বললে, রূপজীবিনীর কন্যা আমি ঘৃণ্য অপবিত্র। ওগো আমার শিরায় শিরায় যে অপবিত্র, পঙ্কিল রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে! কেটে দেখ, সে লহু রক্তবর্ণ নয়, বিষজর্জ্জরিত মুমূর্ষুর মত তা নীল শিয়াহ।” দেখলুম, তার চোখ দিয়ে আগুনের ফিন্‌কীর মত জ্বালাময়ী অশ্রু নির্গত হচ্ছে। বুঝলুম, এত স্নিগ্ধ গৈরিক নির্ঝর নয়, এ যে আগ্নেয়-গিরির উত্তপ্ত দ্রবময়ী স্রোতের বিপুল নিঃস্রাব!

বিছার কামড়ের মত কেমন একটা দংশন-জ্বালা বুকের অন্তরতম কোণে অনুভব কর্‌লুম। ভাবলুম স্বভাব-দুর্গন্ধ যে ফুল, সে দোষ ত সে ফুলের নয়। সে দোষ যদি দোষ হয়, তবে তা স্রষ্টার। অথচ তার বুকেও যে সুবাস আছে, তা' বিশ্লেষণ করে' দেখতে পারে অসাধারণ যে, সে-ই; সাধারণে কিন্তু তার নিকটে গেলেই মুখে কাপড় দেয়, নাক সিঁট্‌কায়............আমি ছিন্নকণ্ঠ বিহগের মত আহত স্বরে বললুম, “তা'—তা' হোক্ মেহের-নেগার! সে দোষ ত তোমার নয়। তুমি ইচ্ছা কর্‌লে কি পবিত্র পথে চল্‌তে পার না? স্রষ্টার সৃষ্টিতে ত তেমন অবিচার নেই। আর বোধ হয় এমনই ভাগ্য-হত যা'রা তাদের প্রতিই তাঁর করুণা অন্ততঃ সহানুভূতি একটু বেশী পরিমাণেই পড়ে, এ যে আমরা না ভেবেই পারিনে!...আর তুমি ত আমায় সত্য করে ভালোবেসেছ! এ ভালোবাসায় যে কৃত্রিমতা নেই, তা আমি যে আমার হৃদয় দিয়ে বুঝ্‌তে পার্‌ছি। আর এ প্রেমের আসল নকল দু'টি হৃদয় ছাড়া সারা বিশ্বের কেউ বুঝতে পার্‌বে না।...হাঁ, আর ভালোবাসায় জীব যখন কাঁদতে পারে, তখন সে অনেক উঁচুতে উঠে যায়। নীচের লোকেরা ভাবে, ‘এ লোকটার অধঃপতন নিশ্চিত।’ অবশ্য একটু পা পিছলে গেলেই যে সে অত উঁচু হ'তে একেবারে পাতালে

এসে পড়বে, তা' সেও বোঝে। তাই সে কারুর কথা না শুনে সাবধানে অম্‌নি উঁচুতেই উঠতেই থাকে।·······না মেহের-নেগার, তোমাকে আমার হতেই হবে!" সে স্থির হ'য়ে বস্‌ল, তারপর মূর্চ্ছাতুরের মত অস্পষ্ট কণ্ঠে কইলে, "ঠিক বলেছ' য়ূসোফ আমার সাম্‌নে অনেকেই এল অনেকেই ডাক্‌ল; কিন্তু আমি কোন দিন ত এমন করে কাঁদিনি। যে আমার সাম্‌নে এসে তার' ভরা অর্ঘ্য নিয়ে দাঁড়িয়েছে, মনে হতো আহা, একেই ভালবাসি। এখন দেখ্‌ছি তা,' ভুল। সময় সময় যে অমন হয় আজ বুঝেছি তা, ক্ষণিকের মোহ আর প্রবৃত্তির বাইরের উত্তেজনা। কিন্তু যে দিন তুমি এসে বল্‌লে, তুমি আমারই, সে দিন আমার প্রাণমন সব কেন একযোগে সাড়া দিয়ে উঠল, হাঁগো হাঁ, আমার সব তোমারই। ওঃ সেকি অনাবিল গভীর প্রশান্ত প্রীতির জোয়ার ছুটে গেল ধমনীর প্রতি রক্ত-কণিকায়! সে এমন একটা মধুর সুন্দর ভাব, যা মানুষে জীবনে একবার মাত্র পেয়ে থাকে,—সেটা আমি ঠিক বুঝতে পার্‌ছিনে! আমাদের এই ভালবাসায় আর দরবেশের প্রেমে সমান গভীরতা এ আমি নিশ্চয় ক'রে বল্‌তে পারি, যদি সেই ভালোবাসা চিরন্তন হয়।"···ক্লান্ত কান্তার মত সে আমার স্কন্ধে মাথাটা ভর ক'রে আস্তে আস্তে কইলে, "তোমাকে পেয়েও যে এই আমি তোমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছি, এ তোমাকে ভালোবাস্‌তে,—প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতে পেরেছি বলে!···আমার—আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে য়ূসোফ, তবে তোমাকে পাবার আশা আমাকে জোর করে' ত্যাগ কর্‌তেই হবে। যাকে ভালবাসি তার'ই অপমান ত কর্‌তে পারিনে আমি! এইটুকু ত্যাগ, এ আমি খুব সইতে পার্‌ব। অভাগিনী নারী জাতি আমাদের এর চেয়েও যে অনেক বড় ত্যাগ

স্বীকার কর্‌তে হয়। তোমরা যাই'ই ভাব, আমাদের কাছে এ কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয় আর কঠিনও নয়।…ওঃ কেন তুমি আমার পথে এলে? কেন তোমার শুভ্র শুচি প্রেমের সোনার কাঠির পরশ দিয়ে আমার অ-জাগন্ত ভালবাসায় জাগিয়ে দিলে?—না, তোমাকে না পেলেও তুমি থাক্‌বে আমারই। তবু আমাদের দু'জনকে দু'দিকে স'রে যেতে হ'বে। যে বুকে প্রেম আছে সেই বুকেই কামনা ওৎ পে'তে পে'তে ব'সে আছে। আমাদের নারীর মনকে বিশ্বাস নেই য়ুসোফ, সে যে বড়ই কোমল, সময়ে একটু তাপেই গলে পড়ে। কে জানে এমন ক'রে থাক্‌লে কোন্ দিন আমাদের এই উঁচু জায়গা হ'তে অধঃপতন হ'বে।….না, না, প্রিয়তম, আর এই কলুষবাষ্পে তোমার স্বচ্ছ দর্পণ ঝাপ্‌সা ক'রে তুল্‌ব না।…আর হয়ত আমাদের দেখা হবে না যদি হয়, তবে আমাদের মিলন হ'বে ঐ—ঐখানে যেখানে আকাশ আর দরিয়া দুই উদার অসীমে কোলাকুলি কর্‌ছে।—বিদায় প্রিয়তম! বিদায়!!" বলেই সে আমার হস্ত চুম্বন ক'রে উন্মাদিনীর মত ছুটে বেরিয়ে গেল।

ঝড় বইছিল শন্—শন্—শন্। আর অদূরের বেণুবনে আহত হয়ে তারই কান্না শোনা যাচ্ছিল আহ্—উহ্ আহা! স্নায়ুছিন্ন হওয়ার মত কট্ কট্ ক'রে বেদনা-আর্ত্ত বাঁশগুলোর গিঁটে গিঁটে শব্দ হচ্ছিল।

এক বুক ব্যথা নিয়ে ফিরে এলুম! ফিরতে ফির্‌তে চোখের জলে আমার মনে পড়্‌ল—সেই আমার স্বপ্নরাণীর শেষ কথা! সেও ত এর মতই বলে'ছিল, "আমাদের মিলন হ'বে এই উদার আকাশের কোলে এম্‌নি এক অরুণ অরুণিমা রক্ত নিশিভোরে যখন বিদায় বাঁশীর সুরে সুরে ললিত বিভাসের কান্না তরল হয়ে ঝরবে!"

(ঘ)

সে দিন যখন আমায় একেবারে বিস্ময়-পুলকিত আর চকিত ক'রে সহসা আমার জন্মভূমি-জননী আমার বুকের রক্ত চাইলে, তখন আমার প্রাণ যে কেমন ছটফট করে' উঠল তা' কইতে পারব না!…শুন্‌লুম আমাদের স্বাধীন পাহাড়িয়া জাতিটার উপর ইংরেজ আর কাবুলের আমির দুজনারই লোলুপ দৃষ্টি পড়ে'ছে। আর কয়েকজন দেশদ্রোহী শয়তান দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে দেশটাকে অন্যের হাতে তুলে দিতে যাচ্ছে। তা'রা ভুলে যাচ্ছে যে, আমাদের এই ঘরবাড়ীহীন পাঠানদের বশে আন্‌তে কেউ কখনও পারবে না। আমরা স্বাধীন—মুক্ত। সে যেই হোক্‌না কেন, আমরা কেন তা'র অধীনতা স্বীকার করতে যাব? শিকল সোনার হ'লেও তা শিকল!—না, না, যতক্ষণ এই য়ুসোফ খাঁর এক বিন্দু রক্ত থাকবে গায়ে আর মাথাটা ধড়ের সঙ্গে লাগা থাক্‌বে ততক্ষণ কেউ, কোন অত্যাচারী সম্রাট আমার জন্মভূমির এককণা বালুকাও স্পর্শ করতে পারবে না। ওঃ একি দুনিয়াভরা অবিচার আর অত্যাচার খোদা তোমার এই মুক্ত সাম্রাজ্যে? এই সব ছোট মনের লোকেই আবার নিজেদের 'উচ্চ' 'মহান' 'বড়' বলে নিজেদের ঢাক পিটায়।—ওঃ যদি তাই হয়, তা'হলে আমাদের অবস্থা কেমন হ'বে যেমন আকাশের অনেকগুলো পাখীকে ধ'রে এনে চারিদিকে লোহার শিক দেওয়া একটা খাঁচার ভিতর পুরে দিলে হয়। ওঃ আমার সমস্ত স্নায়ু আর মাংসপেশীগুলো ফুলে ফুলে উঠ্‌ছে! আরও শুন্‌ছি দু'পক্ষেই আমাদিগকে রীতিমত ভয় দেখান হচ্ছে। হাঃ হাঃ হাঃ। গাছের পাখীগুলোকে বন্দুক দেখিয়ে শিকারী যদি বলে, "সব এসে আমার

হাতে ধরা দেও, নৈলে গুলি ছাড়লুম।" তাহ'লে কি পাখীরা এসে তা'র হাতে ধরা দেবে? কখনই না, তারা মর্‌বে তবুও ধরা দেবে না—দেবে না। এ শিকারীদের বুকে যে ছুরি লুকানো আছে, তা, পাখীরা আপনিই বোঝে। এ তা'দের শিখিয়ে দিতে হয় না। হাঁ আর যদিই যোগ দিতে হয়, তবে নিজের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রেখে যেখানে অন্যায় দেখবে সেইখানেই আমাদের বজ্রমুষ্টির ভীম তরবারির আঘাত পড়বে! আমার জন্মভূমি কোন বিজয়ীর চরণ স্পর্শে কখনও কলঙ্কিত হয়নি আর হবেও না। 'শির দিব, তবু স্বাধীনতা দিব না।'

তোমার পবিত্র নামের শপথ ক'রে এই যে তরবারি ধরলুম খোদা, এ আর আমার হাত হ'তে খস্‌বে না। তুমি বাহুতে শক্তি দাও!—এই তরবারির তৃষ্ণা মিটাব—প্রথমে দেশদ্রোহী শয়তানদের জিগরের খুনে, তারপর দেশ-শত্রুর কলুষ রক্তে।—আমিন!

*　　　*　　　*

হাঁ, আমার মনে হচ্ছে হয়ত আমার দেশের ভাই-ই আমায় হত্যা কর্‌বে জল্লাদ হয়ে!···তা'হোক্, তবুও সুখে মর্‌তে পারব কেন না আমার এ ক্ষুদ্র প্রাণ দেশের পায়েই উৎসর্গীকৃত হ'বে!—খোদা। আমার এ দান যেন তুমি কবুল করো।"

*　　　*　　　*

বেশ হয়েছে! খুব হয়েছে!! আচ্ছা হয়েছে!!!

আমার এই চিরবিদায়ের সময় কেন কাল মনে হ'ল, সে অভাগীকে একবার দেখে যাই। কেন সে ইচ্ছাকে কিছুতেই দমন কর্‌তে পারলুম' না।···গিয়ে দেখ্‌লুম তার ত্যক্ত বাড়ীটা ধূলি আর জঙ্গলময় হয়ে' সদ্যবিধবা নারীর মত হাহাকার কর্‌ছে!···আর—আর ও

কি ?···ঘরের আঙ্গিনায় ও কা'র কবর ? যেন কা'র একবুক বেদনা উপুড় হ'য়ে পড়ে' রয়েছে। কার পাহাড়পারা ব্যথা জমাট হয়ে যেন মূর্চ্ছিত হ'য়ে মাটি আঁকড়ে রয়েছে !···কবরের শিরানে কা'র বুকের রক্ত দিয়ে মর্ম্মর ফলকে লেখা, "অপবিত্র জঠরে জন্ম নিলেও ওগো পথিক, আমায় ঘৃণা করো'না ! একবিন্দু অশ্রু ফেলো' আমার কল্যাণ কামনা করে,—আমি অপবিত্র কিনা জানিনা, কিন্তু পবিত্র ভালোবাসা আমার এই বুকে তার পরশ দিয়েছিল !···আর ওগো স্বামিন্ ! তুমি যদি কখনও এখানে আস,—আঃ তা আস্‌বেই—তবে আমায় মনে ক'রে কেঁদোনা। যেখানেই থাকি প্রিয়তম, আমাদের মিলন হবেই। এমন আকুল প্রতীক্ষার শেষ অবসান এই দুনিয়াতেই হ'তে পারে না ! খোদা নিজে যে প্রেমময় !—অভাগিনী—গুল্‌শন্ !"

আমার একবুক অশ্রু ঝরে' মর্ম্মর ফলকের মলিন রক্ত লেখা গুলিকে আরও অরুণোজ্জ্বল ক'রে দিলে !···

ঝিলমের ওপার হ'তে কা'র আর্ত্ত আর্দ্র স্বর এপারে এসে আছাড় খাচ্ছিল,

আগর্ মেয় বাগ্‌বাঁ হোতে, তো গুল্‌শন কো
লুটা দেতো।
পাকড়্ কর্‌দস্তে বুলবুল কো চমন সে জাঁ
মেলা দেতে॥

হায়রে অবোধ গায়ক ! তুই যদি মালী হতিস্, তা' হ'লে বুলবুলের হাত ধ'রে ফুলের সঙ্গে মিলন করিয়ে দিতিস্ ?—

অসম্ভব রে তা' অসম্ভব ! খোদা হয়ত তোকে সে শক্তি দেননি, কিন্তু যা'দের সে শক্তি আছে ভাই, তাঁরা ত-কই এমন করা ত দূরের

কথা, একবার তোর এই কথা মুখেও আনতে পারে না! তোরই এই ক্ষমতা থাকলে হয়ত তুই এ গান গাইতে পারতিস্‌নে!....

*　　*　　*　　*

তবু আমার চিরবিদায়ের দিনে ঐ গানটা বড্ডো মর্ম্মস্পর্শী মধুর লেগেছিল।



সাঁজের বাতি

সাঁজের তারা

সাঁজের তারার সাথে যেদিন আমার নূতন করে' চেনা-শোনা, সে এক বড় মজার ঘটনা।

আরব-সাগরের বেলার ওপরে একটি ছোট্ট পাহাড়। তার বুক রঙ্‌ বেরঙ্‌-এর শাঁখের হাড়ে ভরা। দেখে মনে হয়, এটা বুঝি একটা শঙ্খ-সমাধি। তাদেরই ওপর একলা পা ছড়িয়ে বসে যে কথা ভাবছিলাম সে কথা কখনো বাজে উদাস পথিকের কাঁপা গলায়, কখনো শুনি প্রিয়-হারা ঘুঘুর উদাস ডাকে; আর ব্যথাহত কবির ভাষায় কখনো কখনো তার আচম্‌কা একটি কথা-হারা কথা—উড়ে-চলা পাখীর মিলিয়ে-আশা ডাকের মত শোনায়।

সে-দিন পথ চলার নিবিড় শ্রান্তি যেন আমার অণুপরমাণুতে আসল-ছোঁওয়া বুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল। ঘুঘুর দেশের রাজকুমারী আমার রুখু চুলের গোড়াগুলি তার রজনীগন্ধার কুঁড়ির মতন আঙুল দিয়ে চোখের ওপর হ'তে তুলে' দিতে দিতে বল্‌লে, "লক্ষ্মীটি এবার ঘুমাও!" ব'লেই সে তার বুকের কাছটিতে কোলের ওপর আমার ক্লান্ত মাথাটি তুলে নিলে। তার সইদের কণ্ঠে বীণার সুর উঠ্‌ছিল—

"অশ্রু নদীর সুদূর পারে
ঘাট দেখা যায় তোমার দ্বারে।"

আমার পরশ-হরষে সদ্য-বিধবার কাঁদনের মত একটা আহত-ব্যথা টোল খাইয়ে গেল। আমি ঘুম-জড়ানো কণ্ঠে কণ্ঠ-ভরা মিনতি এনে বল্‌লাম, "আবার ঐটে গাইতে বল না ভাই!" গানের সুরের পিছু পিছু আমার পিপাসিত চিত্ত হাওয়ার পারে কোন্‌ দিশেহারা উত্তরে

ছুটে চল্‌লো। তারপর···কেউ কোথাও নেই। একা—একা—শুধু একা! ওগো কোথায় আমার অশ্রু-নদী? কোথায় তার সুদূর পার? কোথায় বা তার ঘাট, আর সে কার দ্বারে? দিকহীন দিগন্ত সারা বিশ্বের অশ্রুর অতলতা নিয়ে আরেক সীমাহারার পানে মৌন ইঙ্গিত করতে লাগলো,—"ঐ—ঐ দিকে গো ঐ দিকে!"···হায়! কোথায় কোন্ কে কী ইঙ্গিত করে?

অলস-আঁখির উদাস-চাওয়া আমার সারা অঙ্গে বুলিয়ে মলিন কণ্ঠে কে এসে বিদায়-ডাক দিলে,—"পথিক উঠ! আমার যাবার সময় হয়ে এল।" আমি ঘুমের দেশের বাদশাজাদির পেশোয়াজ-প্রান্ত দু'-হাত দিয়ে মুঠি করে ধরে 'বল্‌লাম, "না না, এখনও ত আমার ওঠ্‌বার সময় হয় নি।···কে তুমি ভাই? তোমার সব কিছুতে এত উদাস কান্না ফুটে' উঠছে কেন?" তার গলার আওয়াজ একদম জড়িয়ে গেল। ভেজা কণ্ঠে সে বল্‌লে, "আমার নাম শ্রান্তি, আজ আমি তোমায় বড্ডো 'নিবিড় করে' পেয়েছিলাম।···এখন আমি যাই, তুমি উঠ! আয় সই ঘুম, ওকে ছেড়ে দে!"

জেগে দেখি, কেউ কোথাও নেই, আমি একা! তখন সাঁজের রাণীর কালো ময়ূরপঙ্খী ডিঙিখানা ধূলি-মলিন পাল উড়িয়ে সাগর বুকে নেমেছে।···জানটা কেমন উদাস হয়ে গেল!···যারা আমার সুপ্তির মাঝে এমন 'করে' জড়িয়ে ছিল, তাদের চেতনার মাঝে হারালাম কেন? এই জাগরণের একা-জীবন কী দুর্বিসহ বেদনার ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত, কী নিষ্করুণ শুষ্কতা তিক্ততায় ভরা। সেইদিন বুঝলাম, কত কষ্টে ক্লান্ত পথিকের ব্যর্থ সন্ধ্যা-পথে উদাস পূরবীর অলস ক্রন্দন এলিয়ে এলিয়ে যায়—

"বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে,
শূন্য ঘাটে একা আমি পার করে'
নাও খেয়ার নেয়ে!"

হায়রে উদাসীন পথিক! তোর সব ব্যর্থ ভাই, সব ব্যর্থ! কোথায় খেয়ার নেয়ে ভাই? কোন্ অচিন্ মাঝিকে এমন বুক-ফাটা ডাক ডাকিস্ তুই? কোথায় সে? কার পথ চেয়ে তোর বেলা গেল? কে সে তোর জন্ম-জন্ম-ধরে'-চাওয়া না-পাওয়া ধন? কোন্ ঘাটে তুই একা বসে এই সুরের জাল বুন্‌ছিস্? এ ঘাটে কি কোন দিন সে তার কলসিটি-কাঁখে চল্‌তে গিয়ে দু'হাতে ঘোমটা ফাঁক করে তোর মুখে চোখে বধূর আধখানা পুলক-চাওয়া থুযে গিয়েছিল? না—কি—সে তার কমল-পায়ের জল-ভেজা পদচিহ্ন দিয়ে তোর পথের বুকে স্মৃতির আল্‌পনা কেটে গিযেছিল? কখনো কাউকে জীবন ভরে' পেলিনে বলেই কি তোর এত কষ্ট ভাই? হায় ও-পারের যাত্রী, তোমার সেই "কবে-কখন্-একটুখানি-পাওয়া" হৃদয়-লক্ষ্মীর চরণ ছোঁওয়া একটি ধূলি-কণাও আজ তোমার জন্যে পড়ে' নেই। বৃথাই সে রেণু-পরিমল পথে পথে খোঁজা ভাই, বৃথা—বৃথা!

অবুঝ মন ও-সব কিছু শুন্‌তে চায় না, বুঝতে চায় না। তার মুখে ক্ষ্যাপা মনসুরের একটি কথা "আনল্ হক্-এর মত যুগযুগান্তের ওই একই অতৃপ্ত শোর উঠ্‌ছে, হায় হায় হারানো লক্ষ্মী আমার! হায় আমার হারানো লক্ষ্মী!"

ঘুমিয়ে বরং থাকি ভালো। তখন যে আমি স্বপনের মাঝে আমার না-পাওয়া লক্ষ্মীকে হাজার বার হাজার রকমে পাই। তাকে এই যে জাগরণের মধ্যে পাবার একটা বিপুল আকাঙ্ক্ষা,—বুকে বুকে মুখে মুখে

চেপে নিতে, সেই তার উষ্ণ-পাওয়াকে আমি ঘুমের দেশে স্বপনের বাগিচায় বড় নিবিড় করেই পাই। মানুষের মন মস্ত প্রহেলিকা। মন নিক্তির মতন যখন যেদিকে ভার বেশী পায়, সেই দিকেই নুয়ে পড়ে। তাই কখনো মনে করি পাওয়াটাই বড়, পাওয়াতেই সার্থকতা। আবার পরক্ষণেই মনে হয়, না—না-পাওয়াটাই পাওয়া, ওই না-পাওয়াতেই সকল পাওয়া সুপ্ত রয়েছে। এ সমস্যার আর মীমাংসা হ'ল না। অথচ দুই পথেরই লক্ষ্য এক! দুই স্রোতেরই লক্ষ্য সাগর-প্রিয়ার সীমা-হারা বুকে নিজের সমস্ত বেগ সমস্ত গতি সমস্ত স্রোত একেবারে শেষ করে ঢেলে' দেওয়া, তারপর নিজের অস্তিত্ব ভুলে যাওয়া—শুধু এক আর এক! কিন্তু এই "প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর" কথাটার এমন একটা নেশা আর মাদকতা রয়েছে, যেটা অনবরত আমার মনের কামনা-কিশোরীকে শিউরিয়ে তুল্‌চে এবং বল্‌ছে, "বন্ধনেই মুক্তি,"— এই যে মানব-মনের চিরন্তনী বাণী, সেটা কি মিথ্যা? না, এ সমস্যার সমাধান নেই।

আবার মনটা গুলিয়ে যাচ্ছে!

আমার মনের ভোগ আর বৈরাগ্যের একটা নিষ্পত্তিও হ'ল না। আর তাই কাউকে জীবন ভ'রে পাওয়াও হ'ল না।

তবে?.........

কাউকে না পেয়েও আমার মনে এ কোন্ আদিম্-বিরহী ভুবনভরা বিচ্ছেদ-ব্যথায় বুক পুরে' মুলুকে মুলুকে ছুটে বেড়াচ্ছে? ক্ষ্যাপার পরশ-মণি খোঁজার মতন আমিও কোন্ পরশ-মণির ছোঁওয়া পেতে দিকে দিকে দেশে দেশে ঘুরে মরছি? কোন্ লক্ষ্মীর আঁচল-প্রান্তে বাঁধা রয়েছে সে মাণিক? কোন্ তরুণীর গলায় রক্ষা-কবচ হয়ে ঝুল্‌চে সে পাথর?

ভাব্‌তে ভাব্‌তে চোখে জল গড়িয়ে এল। সেই জলবিন্দুতে সহসা কার দুষ্টু হাসির চপল কিরণ ছল্‌-ছলিয়ে উঠলো। আমি চম্‌কে সামনে চাইতেই দেখলাম, আকাশের মুক্ত আঙিনায় ললাটের আধফালি ঘোমটায় ঢেকে প্রদীপ-হাতে সাঁজের তারা দাঁড়িয়ে তার চোখের কিনারায়, মুখের রেখায়, অধরপুটের কোণে কোণে দুষ্টুমীর হাসি লুকোচুরি খেল্‌চে। বারে বারে উছ্‌লে-উঠা নিলাজ হাসি ঠোঁটের কাঁপন দিয়ে লুকোবার ব্যর্থ চেষ্টায় তার হাতের মঙ্গল-প্রদীপ কেঁপে কেঁপে লোলুপ শিখা বাড়িয়ে সুন্দরীর রাঙা গালে উষ্ণ চুম্বন এঁকে দেওয়ার জন্য আকুলি বিকুলি কর্‌ছে। পাগলা হাওয়া বারেবারে তার বুকের বসন উড়িয়ে দিয়ে বেচারীকে আরো অসম্বৃত, আরো বিব্রত ক'রে তুল্‌ছে।

অনেকক্ষণ ধ'রে সেও আমার পানে চেয়ে রইল, আমিও তার পানে চেয়ে রইলাম। আমার কণ্ঠ তখন কথা হারিয়ে ফেলেছে।

সে ক্রমেই অস্তপারের-পথে পিছু হেঁটে যেতে লাগ্‌লো। তার চোখের চাওয়া ক্রমেই মলিন সজল হয়ে উঠতে লাগ্‌লো। বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলানোর দরুণ তার বুকের কাঁচলি বায়ুর মুখে কচিপাতার মত থরথর করে' কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো। যতই সে আকাশ-পথ বেয়ে অস্ত-পল্লীর পথে চল্‌তে লাগ্‌লো, ততই তার মুখ চোখ মূর্চ্ছাতুরের মতন হল্‌দে' ফ্যাকাসে' হয়ে যেতে লাগ্‌লো। তারপর পথের শেষ-বাঁকে দাঁড়িয়ে সে তার শেষ অচপল অনিমেষ চাওয়া চেয়ে আমায় একটি ছোট্ট সেলাম করে' অদৃশ্য হয়ে গেল।

হিয়ায় হিয়ায় আমার শুধু একটি কাতর মিনতি মূঢ়ের মত না-কওয়া ভাষায় ধ্বনিত হচ্ছিল—হায় সন্ধ্যা-লক্ষ্মী আমার হায়!"

হঠাৎ আমার মনে হ'ল, আমি কত বছর ধরে' যে এই রকম করে' রোজ সন্ধ্যা-লক্ষ্মীর পানে চেয়ে চেয়ে আস্‌ছি তা কিছুতেই স্মরণ হয় না! শুধু এইটুকু মাত্র মনে পড়ে যে, সে-কোন্-যুগে যেন আমি আজিকার মতনই এমনি করে প্রভাতের শুকতারাটির পানে শুধু উদয়-পথে তাকিয়ে থাক্‌তাম। আমার সমস্ত সকাল যেন কোন্ প্রিয়তমার আসার আশায় নিবিড় সুখে ভরে' উঠ্‌তো। রোজ প্রভাতে উদয়-পথে মুঠি-মুঠি করে' ফাগ-মাখা ধুলি-রেণু ছড়াতে ছড়াতে সে আস্‌তো। তারপর আমার পানে চেয়েই সলজ্জ তৃপ্তির হাসি হেসে যেন বারে-বারে আড়-নয়নের বাঁকা চাউনি হেনে বল্‌তো, "ওগো পথ-চাওয়া বন্ধু আমার, আমি এসেছি!" আমি তার চোখের ভাষা বুঝতে পারতাম, তার চাওয়ার কওয়া শুন্‌তে পেতাম।...তারপর অরুণদেব তাঁর রক্ত-চক্ষু দিয়ে আমাদের পানে চাইলেই সে ভীতা বালিকার মত ছুটে আকাশ-আঙিনা বেয়ে উর্দ্ধে—উর্দ্ধে আরো উর্দ্ধে উধাও হয়ে যেত। ছুট্‌তে ছুট্‌তেও কত হাসি তার! সারাদিন আমি শুন্‌তে পেতাম তার ঐ পালিয়ে-যাওয়া পথের বুকে তার কটি-কিঙ্কিণীর রিণিঝিণি, হাতের পান্নার চুড়ির রিণিঝিণি আর পায়ের গুজ্‌রী পাঁইজোরের রুমুঝুমু। এমন করে' দিন যায়। একদিন আমি বল্‌লাম, "তুমি কি আমার পথে নেমে আসবে না প্রিয়?" সে আমার পানে একটু তাকিয়েই সিঁদুরে' আমের মত রেঙে উঠে' আধ-ফোটা কথায় কেঁপে বল্‌লে, "না প্রিয়, আমায় পেতে হ'লে তোমাকে এই তারারই একটি হ'তে হবে। আমি নেমে যেতে পারি নে, তোমাকে আমার পথেই উঠে আস্‌তে হবে।" বল্‌বার সময় অনামিকা অঙ্গুলি দিয়ে তার বেনারসি চেলীর আঁচলপ্রান্ত যেমন সে আনমনে জড়িয়ে যাচ্ছিল, তার চোখের চাওয়া মুখের কথা সেদিন যেন তেমনি

করেই অসহ ব্যথা-পুলকে জড়িয়ে জড়িয়ে যাচ্ছিল। বুঝলাম, সে বিশ্বের চিরন্তন ধারাটি বজায় রেখেই আমার সঙ্গে মিল্‌তে চায়। আমার সৃষ্টিছাড়া-পথে বেরিয়ে পড়্‌তে তার কোমল বুকে সাহস পাচ্ছে না। যতই ভালোবাসুক না, আমার পথ-হারা পথে চল্‌তে-আমার বিপুল ভার বয়ে সেই অজানা ভয়ের পথে চল্‌তে—সে যেন কিছুতেই পারবে না।

কিন্তু তাই কি?

হয়ত তা' ভুল। কেননা একদিন যেন সে বলেছিল, "প্রিয়তম, এ যে তোমার ভুলের পথ, এ পথ ত মঙ্গলের নয়। আঘাত দিয়ে তোমায় এ পথ হতে ফিরাতেই হবে। তোমায় কল্যাণের পথে না আন্‌তে পার্‌লে ত আমি তোমার লক্ষ্মী হতে পারিনে!" সে কথা যেন আজকের নয়, কোন্ অজানা নিশীতে আমি ঘুমের কানে শুনেছিলাম। তখন তা কিন্তু বুঝ্‌তে পারিনি।

আমি যেমন কিছুতেই তার চিরন্তন ধারাটীর একগুঁয়েমি সইতে পারলাম না, সেও তেম্‌নি নীচে নেমে আমার পথে এল না।

বিদায় নেবার দিনও সে তেমনি করে হেসে গেছে। তেম্‌নি করেই তার দুষ্টু চটুল চাউনি দিয়ে সে আমায় বারে বারে মিষ্টি বিদ্রূপ করেছে। শুধু একটা নতুন কথা শুনিয়ে গেছ্‌ল, আর এ পথে আমাদের দেখা হবে না প্রিয়, এবার নতুন করে নতুন পথে নতুন পরিচয় নিয়ে আমরা আমাদের পূর্ণ করে চিন্‌বো।"

তার বিদায়-বেলার যে দীঘল শ্বাসটি শুনেও শুনি নি, আজ আমি সারা বাতাসে যেন সেই ব্যথিত কাঁপুনিটুকু অনুভব করছি। এখন সে বাতাস নিতেও কষ্ট হয়।...কবে আমার এ নিশ্বাস-প্রশ্বাসে-টেনে নেওয়া বায়ুর আয়ু চিরদিনের মত ফুরিয়ে যাবে প্রিয়?...তার বিদায়-

চাওয়ার যে ভেজা দৃষ্টিটুকু আমি দেখেও দেখিনি, আজ সারা আকাশের কোটি কোটি তারার চোখের পাতায় সেই অশ্রুকণাই দেখ্‌তে পাচ্ছি! এখন তারা হাস্‌লেও মনে হয়, শুধু কান্না আর কান্না।

তারপর রোজ আসি রোজ যাই, কিন্তু উদয়-পথে আর তার রাঙা চরণের আলতার আলপনা ফুট্‌লো না! এখন অরুণ রবি আসে হাস্‌তে হাস্‌তে। তার সে হাসি আমার অসহ্য। পাখীর কণ্ঠের বিভাস সুর আমার কাণে যেন পূরবীর মত করুণ হয়ে বাজে।...

আমি বল্‌লাম, হায় প্রিয়তম, তোমায় আমি হারিয়েছি!" দেখ্‌লাম আকাশ বাতাস আমার সে কান্নায় যোগ দিয়ে বল্‌ছে, "তোমায় হারিয়েছি!" তখন সন্ধ্যা—ঐ সিন্ধু-বেলায়।

হঠাৎ ও' কার চেনা-কণ্ঠ শুনি? ও' কার চেনা-চাওয়া দেখি? ও' কে রে, কে?"

বল্‌লাম, "আজ এ বধূর বেশে কোথায় তুমি প্রিয়?" সে বল্‌লে "অস্ত-পথে!

সে আরও বলে' গেছে যে, সে রোজই তার ম্লানমূর্ত্তি নিয়ে এই অস্ত-গাঁয়ের আকাশ-আঙিনায় সন্ধ্যা-প্রদীপ দেখাতে আস্‌বে। আমি যেন আর তার দৃষ্টির সীমানায় না আসি।

বুঝলাম সে যতদিন অস্ত-পারের দেশে বধূ হয়ে থাক্‌বে, ততদিন তার দিকে তাকাবারও আমার অধিকার নেই। আজও সে তার জগতের সেই চিরন্তন সহজ ধারাটুকুকে বজায় রেখে চল্‌ছে! সে তো বিদ্রোহী হ'তে পারে না। সে যে নারী—কল্যাণী। সে-ই না বিশ্বকে সহজ ক'রে রেখেচে, তার অনন্ত ধারাটিকে অক্ষুন্ন সামঞ্জস্য দিয়ে ঘিরে রেখেছে।

শুধোলাম, "আবার কবে দেখা হবে তবে? আবার কখন পাবে৷ তোমায়?" সে বল্‌লে, "প্রভাত বেলায় ওই উদয়-পথেই।"

আজ সে বধূ, তাই তার সাঁজের-পথে আর তাকাই নি। জানি নে, কবে কোন্ উদয়-পথে কোন্ নিশিভোরে কেমন করে' আমাদের আবার দেখা-শুনা হবে। তবু আমার আজো আশা আছে, দেখা হবেই, তাকে পাবই!

* * * * *

সিন্ধু পেরিয়ে ঘরের আঙিনায যখন একা এসে ক্লান্ত চরণে দাঁড়ালাম, তখন ভাবিজি জিজ্ঞাসা করলেন, "হাঁ ভাই, তুমি নাকি বে করেছ?" আমি মলিন হাসি হেসে বল্‌লাম 'হাঁ!' তিনি হেসে শুধোলেন, "তা বেশ করেছ। বধূ কোথায়? নাম কি তার?"

অনেক্ষণ নিঃশব্দে বসে' রইলাম। শ্রী-রাগের সুরে সুর-মূর্চ্ছিতা মলিনা সন্ধ্যার ঘোম্‌টার কালো আবছায়া যেন সিয়াহ্ কাফনের মত পশ্চিমমুখী ধরণীব মুখ ঢেকে ফেল্‌তে লাগ্‌লো। আমি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম।

তারপর অতিকষ্টে ঐ পশ্চিম-পারের পানে আঙুল বাড়িয়ে বল্‌লাম, "অস্তপারের সন্ধ্যা-লক্ষ্মী!"

ভাবিজানের ডাগর আঁখিপল্লব সিক্ত হয়ে উঠ্‌লো; দৃষ্টিটুকু অব্যক্ত ব্যথায় নত হয়ে এলো। কালো সন্ধ্যা নিবিড় হয়ে নেমে এলো।

রাক্ষুসী

রাক্কুসী

(বীরভূমের বাগ্‌দীদের ভাষায়)

(ক)

"আজ এই পুরো দুটো বছর ধ'রে ভাবছি, শুধু ভাবছি,—আর সব চেয়ে আশ্চয্যি হচ্ছি, লোকে আমাকে দেখ্‌লেই এমন করে ছুটে পালায় কেন! পুরুষেরা, যাঁরা সব পর্দ্দার আড়ালে গিয়ে মেয়েমহলে খুব জাঁদ্‌রেলি রকমের শোরগোল আর হাল্লা করেন, আর যাঁদের সেই বিদ্‌ঘুটে চেঁচানির চোটে ছেলেমেয়েরা ভয়ে 'নফ্‌সি নফ্‌সি' করে, সেই মদ্দরাই আবার আমায় দেখ্‌লে হুঁকো হাতে দাওয়া হ'তে আস্তে আস্তে সরে' পড়েন, তখন নাকি তাঁদের অন্দর মহলে যাবার ভয়ানক 'হাজত' হয়! মেয়েরা আমাকে দেখ্‌লেই কাঁক হতে' ডুম্ করে' কল্‌সী ফেলে সে কি লম্বা ছুট দেয়! ছেলেমেয়েরা ত নাকমুখ সিঁটকে ভয়ে একেবার আঁৎকে উঠে। হাজার গজ দূরে থেকে বলে, "ওরে বাপ্‌রে, ঐ এল পাগ্‌লী রাক্কুসী মাগী, পালা—পালা! খেলে, খেলে!"—কেনে! আমি কোন্ উনোনমুখো স্থ্যঁটকোর পাকা ধানে মই দিয়েছি? কোন্ খাল্‌ভরা ড্যাকরার মুখে আগুন দিয়েছি? কোন্ চোখ্‌খাগী আবাগীর বেটির বুকে বসে তপ্তখোলা ভেঙেছি? কা'র গতর আমকাঠ না কুল-কাঠের আথায় চড়িয়েছি? কোন্ ছেলেমেয়ের কাঁচা মাথাটা চিবিয়ে খেয়েছি? বল্‌ত বুন, তাদের কি 'সরোকার' আছে আমায় যা' তা' বল্‌বার? কে তা'রা আমার?—মেরেছি?—বেশ করেছি, নিজের 'সোয়ামীকে' মেরেছি!···শুধু মেরেছি? দা'

দিয়ে কেটেছি! তা'তে ওদের এত বুক চড়্‌চড়্‌ করবে কেনে? ওদের কারুর বুক থেকে ত সোয়ামীকে কেড়ে লি' নাই, আর হত্যেও করি নাই, তা'তে ওদের কথা বল্‌বার আর সাওখুড়ি করবার কি আছে? ওরা কি আমার সাতপুরুষের কুটুম না গিয়া'ত? যদি এই রকমই কর্‌তে থাকে, তবে আমি সত্যিকারের রাক্ষুসীই হয়ে দাঁড়াব বলে' রাখ্‌ছি তখন।' এক এক দায়ের কোপে ওদের সোয়ামীর মাথাগুলো ধড় থেকে আলাদা করে দিব, মেয়েগুলোর বুক ফেঁড়ে কস্‌জেগুলো ধরে' পিশে পিশে দিব, তবে না সে আমার নাম সত্যি-সত্যিই রাক্ষুসী হয়ে দাঁড়াবে!

"আমায় পাগল করলে কে? এই মানুষগুলোই ত—আমি ত ফের তেম্‌নি করেই—যেন কিছুই হয় নাই—ঘর পেতেছিলুম। রাত্তির দিন আমার কানের গোড়ায় আনাচে কাণাচে, পথে, ঘাটে, কাজকর্ম্মে, মজলিসে জৌলুসে আমার নামে রাক্ষুসী রাক্ষুসী বলে' কুৎসা ঘেন্না, মুখ ব্যাঁকানি, চোখ রাঙানি,—এই সব মিলেই ত আমার মাথার মগজ বিগড়ে দিল? যে ব্যাথাটাকে আমি আমার মনের মাঝেই চেপে রেখেছিলুম, সেটাকে আবার জাগিয়ে তুলে চোখের সাম্‌নে সোজা করে ধর্‌লে ত এরাই! আচ্ছা তুই-ই বল্‌ত বুন, এ পাগল হওয়ার দোষটা কার? একটা ভাল মানুষকে খোঁচা মেরে মেরে ক্ষেপিয়ে তুল্‌লে সে দোষটা কি সেই ভালমানুষের, না যে ভাল-মানুষেরা তাকে ক্ষেপিয়ে তোলে, তাদের?"—

"আমার সোয়ামী ছিল সিদেসাদা মানুষ, সে ত সোজা ছাড়া বাঁকা কিছু জান্‌ত না। সে চাষ কর্‌ত, কির্‌ষাণি করত, আমি সারাটি দিন মাছ ধরে', চাল কেঁড়ে', ধান ভেনে' আন্‌তুম। তা না হ'লে চল্‌বে

কি ক'রে দিদি? তখন আমাদের তিনটি পুষ্যি,—বড় ছেলে সোমত্থ হয়ে উঠেছে, বে'থা না দিলে উপর-নজর হবে, মেয়েটাও ঢ্যাং-ঢেঙিয়ে বেড়ে উঠেছিল আর আমার কোলপুঁছা' ছোট মেয়েটিরও তখন হাঁক্কো হাঁক্কো করে দু-একটি কথা ফুট্‌ছিল। ছা-পোষা মানুষ হ'লেও দিদি আমাদের সংসারে ত অভাব ছিল না কোন কিছুর, তোমাদের পাঁচজনের আশীর্ব্বাদে। এই বিন্দিই তখন নাই নাই করে' দিনের শেষে তিনটি সের চা'ল তরকারীর জন্যে মাছ রে, শামুক রে, গুগ্‌লি রে, পিথিমির জিনিষ জোগাড় করে আন্‌ত। তা ছাড়া বড় ছেলেটাও তোমাদের শ্রীচরণের আশীর্ব্বাদে করে' কর্ম্মে' দু' পয়সা ঘরে আন্‌ছিল। মেয়েটাও পাড়ার বৌ-ঝিদের সঙ্গে যা দু'চারটে শাগ মাছ আন্‌তো তাতেও নেহাৎ কম পয়সা হ'ত না, লুণ তেলের খরচটা ওর বেশ দিব্যি চলে যেত। এ সবের উপর সোয়ামী বছরের শেষে চাষবাস আর কির্‌ষাণি করে যা ধানচাল আনত, তাতে সারা বছর খুব 'নচল বচল' ক'রে খেয়েও ফুরাত না। সংসারের তখন কি ছিরিই ছিল! লক্ষ্মী যেন মুখ তুলে চেয়েছিলেন। এত সব কার জন্যে—ঐ ছেলে-মেয়েগুলির জন্যেই ত? সারা দিন রেতে' একটি সেরের বেশী চাল রাঁধতুম না। বলি, আহা, শেষে আমার ছেলেরা কষ্ট পাবে! সোয়ামী আর ছেলেগুলোকে দিতুম ভাত, আর নিজে খেতুম মাড়—শুদ্ধু ভাতের ফেণ! মেয়ে মানষের আবার সুখ কি, ছেলেমেয়ে যদি ঠাণ্ডা রইল তাতেই আমাদের জান ঠাণ্ডা! নাইবা হলুম জমিদার। আমরা ত কারুর কাছে ভিক্ষে কর্‌তুম না, চুরি দারিও কর্‌তুম না। নিজের মেহনতের পয়সা নেড়ে চেড়ে খেতুম। নিজে খেতুম, আর পালেরে পার্ব্বনেরে যেমন অবস্থা দুদশটা অতিথ ফকিরকেও খাওয়াতুম।

আহা, ওতেই ত আমার বুক ভরে' ছিল দিদি! লোকে বল্‌ত আমি নাকি বড্ডো 'কিরপিণ', কারণ আমি একটি পয়সা বাজে খরচ করতুম না। তা বল্‌লে আর কি করব, তাতে আমার বয়ে যেত না। তারা ত জান্‌ত না, আমার মাথায় কি বোঝা চাপানো রয়েছে। দু দুটো মেয়ে আর একটি ছেলের বিয়ে দিতে হবে, বাড়ীতে বউ আস্‌বে, জামাই আস্‌বে, আমার এই মাটির ঘরই আনন্দে ইন্দিরপুরি হয়ে উঠ্‌বে, দুটো সাদ আরমান আছে—তাতে কত খরচ বল্ দিকিনি বুন? দায়ে ঠেক্‌লে কেউ একটা পয়সা কর্জ্জ দিয়ে চালাবে? বাপ্‌রে বাপ্, এই বিন্দির অজানা নেই গো, গলায় সাপ বেঁধে পড়্‌লেও কোন বেটি একটি ক্ষুদকণা দিয়ে শুধোয় না। তার আবার গুমোর! আমার কাছে ও-সব শুধু কথায় চিঁড়ে ভিজে না বাপু। তবে বুঝ্‌তুম, অনেক কড়ুই রাড়ীর বুক চচ্চড় কর্‌ত হিংসেয়, আমাদের এই এতটুকু সুখ দেখে।

"এম্‌নি করেই খুব সুখে দিন যাচ্ছিল আমাদের! আমি মনে করতুম, আর য'টা দিন বাঁচি এম্‌নি করে সোয়ামীর সেবা করে', ছেলে-মেয়ে চরিয়ে, নাতি পুতি দেখে আমার হাতের নোওয়া অক্ষয় রেখে, মরি; কিন্তু তা আর পোড়া বিধাতার সইল না। আমার সাধের ঘরকন্না শ্মশানপুরী হ'য়ে গেল! আমার এত আশা ভরসা সব-তাতে চুলোর ছাই-পাঁশ পড়্‌ল! শুনে যা দিদি, শুনে যা সব, আর যদি দোষ দেখিস্ ত তোর ঐ মুড়ো খ্যাংরা দিয়ে আমার বিষ ঝেড়ে' দিয়ে যাস্, সাত উনুনের বাসি ছাই আমার পোড়া মুখে দিয়ে দিস্! হায় বুন্, আমার 'দুখ্‌খুর' কথা শুন্‌লে পাথর গলে মোম হয়ে যায়, কিন্তু গাঁয়ের এই বেদিল্ মানুষগুলো আমায় এতটুকু পের্‌বোধ ত দেয়ই না, তার উপর রাত্তির দিন নানান কথা বলে' জান্‌টাকে

ক্ষেপিয়ে তুলেছে? মনে করি আমার সব পেটের কথা কারুর কাছে তন্ন তন্ন করে বলি আর খুব একচোট কেঁদে নিয়ে মনটাকে হাল্‌কা করি। তা যারই কাছ ঘেঁসতে চাই সেই মনে করে এই আমার খেলে'রে! আমি যেন ডাইনি কুহুকীরও অধম! এই 'হেনেস্থা' আর ভয় করার দরুণে আমার সমস্ত মগজটা চম্‌চম্ করে ধরে যায়, কাজেই আমার পাগলামি তখন আরও বেড়ে যায়। সাধে কি আমার মুখ দিয়ে এত গালিগালাজ শাপমণ্যি বেরোয় বুন! তুই সব কথা শুন্ আর নাথি মেরে' আমার থোঁতা মুখ ভোঁতা করে' দিয়ে যা!

(খ)

"তু ত বরাবরই জানতিস্ দিদি, আমাদের পাঁচুর বাপ ছিল বরাবরকার সিদেসাদা মানুষ, সে হের-ফের বা কথার প্যাঁচ বুঝ্‌তে না। নাকটা সোজাসুজি না দেখিয়ে হাতটা পিঠ দিক দিয়ে বাঁকিয়ে এনে দেখানোটা তার মগজে আদৌ ঢুকত না। কত আঁটকুড়ো নদী-ভরাই যে ওকে দিয়ে বিনি পয়সায় বেগার খাটিয়ে নেত, হাত হ'তে পয়সা ভুলিয়ে নেত, তার আর সংখ্যা নাই! ঐ নিয়ে বেচারাকে আমি কতদিন গা'লমন্দ দিয়েছি, কত বুদ্ধি দিতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। কথায় বলে, 'স্বভাব যায় না মলে'—ওর আর একটা বদ্ অভ্যেস ছিল, ও বড্ড মদ খেত। কতদিন বলেছি, "তুমি মদ খাও ক্ষতি নেই, দেখো তোমায় মদে যেন না খায়!" কিন্তু সে তা শুন্‌ত না; একটু ফাঁক পেলেই যা রোজগার কর্‌ত তা সব শুঁড়ির পায়ে ঢেলে আসত। যাক্, ওরকম দুচারটে বদ্ অভ্যাস পুরুষমানুষের

থাকেই থাকে—ওতে তেমন আসৃত যেত না, কিন্তু অমন শিবের মত সোয়ামী আমার শেষে এমন কাজ করে ফেল্‌লে, যা বুন্, তুই কেন— আমারও বিশ্বাস হচ্ছে না। তার মত অমন সোজা লোক পেয়ে কে কি খাইয়ে দিয়ে তাকে যে অমন করে দিয়েছিল, তা আমি নিজেই বুঝতে পারি নাই।

"জানিস্ ওপাড়ার রঘো বাগ্দীর দু-তিনটে 'স্যাঙ্গাকরা' 'কড়ুই রাঁড়ীর মেয়েটা কি-রকম পাড়া মাথায় করে তুলেছিল। ছুঁড়ি কখনও সোয়ামীর ঘর ত করেই নাই, মাঝে থেকে পাড়ার ছেলে ছোকরাদের কাঁচা বুকে ঘুণ ধরিয়ে দিচ্ছিল। আর তার বাপ মাকেই বা কি বল্‌ব, —ছি, আমারই মনে হ'ত যে, বিষ খেয়ে মরি! মাগো মা, বাগ্দী জাতটার ওপর ঘেন্না ধরিয়ে দিলে!—

"তু ত জানিস মাখন-দি, ঝুটমুট আমাদের গাঁয়ের লোকের আর আমাদের বাগ্দীগুলোর বিশ্বাস ছিল যে, আমাদের হাতে অনেক টাকা আছে। আবার সে কত পুত্‌খাগীর বেটিরা লোকের ঘরে ঘরে রটিয়ে এসেছিল, আমরা নাকি যক্ষির টাকা পেয়েছি। বল্‌ত বুন, এতে হাসি পায় না?

"হে,—আমাদের ঐ টাকার লোভেই ঐ "রাঁড় হয়ে ষাঁড় হওয়া" ছুড়িটা ঐ শিবের মত সোজা ভোলানাথ সোয়ামীকে আমার পেয়ে বসল। আর সত্যি বল্‌তে কি, মিনসের চেহারাও ত আর নেহাৎ মন্দ ছিল না! ধুতি চাদর পরিয়ে দিলে মনে হত একটি খাসা 'ভদ্দরনুক'।'

"ওর যেদিন আমি পেত্থম এই কথাটি শুনলুম, তখন আমার মনটা যে কেমন হয়ে গেল; তা বুন্ তোকে ঠিক বুঝিয়ে বল্‌তে পারব

না। মাথায় বাজ পড়লেও বোধ হয় লোকে অত বেথা পায় না। আমি সেদিন তাকে রাতে খুব ঝাঁটাপেটা করলুম। অ' বুন! —যে অমন মাটির মানুষ, সাতচড়ে যার রা বেরোত না সেও কিনা সেদিন আমার এই ঝুঁটি ধরে' একটা চেলাকাঠে করে' উঃ সে কি মার মারলে। কাঠটার চেয়েও বেশী ফেটে' ফেটে' আমার পিঠ দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল! কিন্তু সত্যি বলতে কি, তখনকার এত যে বাইরের বেথা, তা'ত আমি বুঝতে পারছিলুম না, কেন না আমার বুকটা তখন আরো বেশী ফেটে' গিয়েছিল! আমি যে সেদিন স্পষ্ট বুঝলুম, আমার নিজের সোয়ামী আজ পর হ'ল! আমি দেখতে পেলুম, আমার কপাল পুড়েছে। তখন ঠিক যেন কেউ তপ্ত লোহা দিয়ে আমার বুকের ভিতরটায় ছ্যাকা দিচ্ছিল—আমি ফুঁপিয়ে উঠলুম!

"সে সঙ্গে আমার যত রাগ হ'ল সেই হারামজাদি বেটির উপর। মনে হ'তে লাগল এখন যদি তাকে পাই, ত নখে করে' ছিঁড়ে ফেলি। কিন্তু কোনদিনই তার নাগাল পাই নাই। সে আমাকে দেখলেই সরে' পড়ত।

(গ)

"ক্রমেই আমার সোয়ামী বাড়াবাড়ি আরম্ভ করলে। সে আর প্রায়ই ঘরে আস্‌ত না! মুনিব-ঘরে খাট্‌ত, খেত, আর ওদের ঘরটাতেই গিয়ে শুয়ে থাকত! আমি, আমার ছেলে, পাড়ার সব ভাল লোক মিলে কত বুঝালুম তাকে, কিন্তু হায়, তাকে আর ফিরাতে পারলুম না, ছুঁড়ি যে ওকে যাদু করেছিল! একেবারে ভেড়া বানিয়ে দিয়েছিল! তখন বুঝ্‌লুম এতদিনে মিন্‌ষের ভীমরতি ধরেছে।

ওকে 'উনপঞ্চাশে' পেয়েছে; তা নৈলে কি এমন চোখের মাথা খেয়ে বসে লোকে! একদিন পায়ে ধরে' জানালুম, সে কত বড় ভুল কর্‌তে যাচ্ছে। সে আমার মুখে লাথি মেরে চলে গেল। আমার সারা দেহ দিয়ে আগুনের মত গরম কি একটা ঠিক্‌রে বেরুতে লাগ্‌লো; বুঝলুম সে এত বেশী এগিয়ে গিয়েছে নরকের দিকে যে, তাকে ফেরানো যায় না।

"তার উপর রাস্তায় ঘাটে ঐ বিশ্রী কথাটা নিয়ে আমার গঞ্জনা— খোঁচা। আমি ক্ষেপার মত হয়ে পেতিজ্ঞা করলুম, শোধ নেব, শোধ নেব। তবে আমার নাম বিন্দি!

"আর একদিন মাঠ হ'তে এসে শুনলুম মিন্‌ষে নাকি আমার বাক্‌স ভেঙ্গে, জোর করে' যা দুচার-পয়সা জমিয়ে ছিলুম সব ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, একটা কাণা কড়িও থুয়ে যায় নাই। আরও শুন্‌লাম, তার দু'দিন পরেই নাকি ঐ ছুঁড়ির সঙ্গে, তার "স্যাঙ্গা হবে। সব ঠিকঠাক হ'য়ে গেছে। সে নাকি ঐ সমস্ত নগদ টাকা নিয়ে গিয়ে তার হবু-শ্বশুরের 'শ্রীপাদপদ্মে' ঢেলেছে। হায়রে আমার রক্তের চেয়েও পিয়ারা টাকা। তার এই দশা হ'ল শেষে? মানুষ এত নীচুদিকে যেতে পারে? তখন ভাব্‌বার ফুরসৎ ছিল না, ঐ দুদিনের মধ্যেই যা কর্‌বার একটা করে' নিতে হবে, তারপর আর সময় পাওয়া যাবে না। ভাব্‌তে লাগলুম, কি করা যায়? একটা দেব্‌তার মত লোক সিধা নরকে নেমে যাচ্ছে এক এক পা ক'রে আর বেশী দূর নাই, অথচ ফিরাবার কোন উপায় নাই। তখন তাকে হত্যা কর্‌লে কি পাপ হয়? তাছাড়া আমি তার 'ইস্ত্রি', আমারও ত একটা কর্ত্তব্য আছে, আমার সোয়ামী যদি বেপথে যায়, ত আমি না ফিরালে অন্য কে এসে ফিরাবে?

আর সে এই রকম বেপথে গেলে ভগবানের কাছে ধর্ম্মতঃ আমিই তো দায়ী। ধর আমি যদি তাকে এই সময়ে একেবারে শেষ করে' ফেলি তাহ'লে তার ত আর কোন পাপ থাকবে না। যত পাপ হবে আমার। তা হোক, সোয়ামীর পাপ তার 'ইস্ত্রি' নেবে না ত কি নেবে এসে শেওড়াগাছের ভূত?

"আমি মনকে শক্ত করে' ফেল্‌লুম! হাঁ, হত্যেই কর্‌ব যা থা'কে কপালে!—ভগবান তুমি সাক্ষী রইলে, আমি আমার দেবতাকে নরকে যাবার আগে তাঁর জানটা তোমার পায়ে জবা ফুলের মত 'উচ্ছুগ্গু' কর্‌ব, তুমি তাঁর সব সব পাপ খণ্ডন করে' আমাকে শুদ্‌ 'দুখখু' আর কষ্ট দাও! আমার তাই আনন্দ!

"সেদিন সাঁঝে একটু ঝিম্‌ঝিম্ বিষ্টির পর মেঘটা বেশ পরিষ্কার হয়ে এসেছে। এমন সময় দেখ্‌তে পেলুম, আমার সোয়ামী একা ঐ আবাগীদের বাড়ীর পেছনের তেঁতুল গাছটার তলায় বসে খুব মন দিয়ে একটা খাটের খুরোয় র‍্যাঁদা বুলোচ্ছে!—কি করতে হবে ঝাঁ করে ভেবে নিলুম! চারিদিকে তাকিয়ে দেখ্‌লুম কেউ কোথাও নাই। আমি পাগ্‌লার মত ছুটে এসে দাটা বের করে' নিলুম, সাঁজের সূর্য্যটার লাল আলো দাটার উপর পড়ে চক্‌মক্ করে' উঠ্‌ল—ঐ ঝাপসা রোদেই আবার বিষ্টি নেমে এল— ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্! বাড়ীর পাশে তখন একপাল ন্যাংটা ছেলে জলে ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে গাইছিল .

"রোদে রোদে বিষ্টি হয়,
খ্যাঁকশিয়ালের বিয়ে হয়।"

"আমি আঁচলে দাটা লুকিয়ে দৌড়ে' বাঘিনীর মত গিয়ে ওঃ কি সে জোরে তার বুকে চেপে বস্‌লুম! সে হাজার জোর করেও আমায়

উল্টিয়ে ফেল্‌তে পারলে না! তার ঘাড়ে মস্ত একটা কোপ বসিয়ে দিতেই আমার হাতটা অবশ হয়ে এল! তখন সে দৌড়ে পাশের পাটক্ষেতটায় গিয়ে চীৎকার করে' পড়্‌ল! আমি তখন রক্তমুখো হয়ে উঠেছি! আমি আবার গিয়ে দুটো কোপ বসাতেই তার ঘাড় হ'তেই মাথাটা আলাদা হয়ে গেল! তারপর খালি লাল আর লাল!—আমার চারিদিকে শুধু রক্ত নেচে' বেড়াতে লাগল!—তারপর কি হয়েছিল আমার আর মনে নেই।

"যেদিন আমার বেশ জ্ঞান হ'ল সেদিন দেখ্‌লুম আমি একটা নতুন জায়গায় রয়েছি, আর তার চারিদিকে সে কতই রং বেরং এর লোক! আর সব চেয়ে আশ্চর্য্য হচ্ছিলুম এই দেখে যে আমিও তাদের মাঝে খুব জোরে জাঁতা পিশ্‌ছি! এতদিনের পর সূর্য্যের আলো—ওঃ সে কত সুন্দর সাদা হয়ে দেখালো! এর আগে চোখের পাতায় শুধু একটা লাল রং ধূ ধূ কর্‌ত। জিজ্ঞাসা করে' জান্‌লুম ওটা শিউড়ির জেলখানা। আমার সাত বছরের জেল হয়েছে! এই—মাত্তর তিনমাস গিয়েছে। আমি নাকি ম্যাজিষ্টর সাহেবের কাছে সব কথা নিজে মুখে স্বীকার করেছিলুম। তবে আমার শাস্তি অত হত না—দারোগাবাবু গাঁয়ে গিয়ে খুব বাড়াবাড়ি করায় আমি নাকি তাকে খ্যাংরাপেটা করে' বলেছিলুম, সে যেন জোর জুলুম না করে গাঁয়ে, সে-ই নাকি সাহেবকে বলে' এত শাস্তি দিইয়ে দিয়েছে।

"মাগো মা! সে কি খাটুনি জেলে! তবু দিদি, যতদিন মনে ছিল না কিছু, ততদিন যে বেশ ভাল ছিলুম! জ্ঞান হয়ে সে কি জ্বালা! তখন কাজের অকাজের মাঝে চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠ্‌ত সেই ফিং-দিয়ে-ওঠা হাল্‌কা হাল্‌কা রক্ত! ওঃ কত সে রক্তের তেজ! বাপ্‌রে

বাপ্ সে মনে পড়লে আমি এখনও বেঁহুস হয়ে পড়ি! মাথাটা যখন কাটা গেল, তখন ঐ আলাদা ধড়টা, কাৎলা মাছকে ডেঙ্গায় তুল্‌লে যেমন করে ঠিক তেমনি করে' কাৎরে' কাৎরে' উঠ্‌ছিল! এত রক্তও থাকে গো একটা এতটুকু মানুষের দেহে! আমি একটুকুও আঁধারে থাকতে পারতুম না ভয়ে! কেন না তখন স্পষ্ট এসে দেখা দিত সেই মাথাছাড়া দেহটা আর দেহছাড়া মাথাটা!—ওঃ—

"তারপর দিদি, কোন্ জজ্জ' নাকি সাত সমুদ্দুর তের নদী পার হয়ে এসে দিল্লীর বাদসাহী তক্‌তে বস্‌লেন, আর সব কয়েদীরা খালাস পেল! আমিও তাদের সাথে ছাড়া পেলুম!

"দেখ্‌লি দিদি ভগবান আছেন! তিনি ত জানেন, আমি ন্যায় ছাড়া অন্যায় কিছু করি নাই। নিজের সোয়ামী দেবতাকে নরকে যাবার আগেই ও পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছি। পুরুষেরা ওতে যাই বলুক, আমি আর আমার ভগবান এই দুই জনাতেই জান্‌তুম, এ একটা মস্ত সোজাসুজি সত্যিকার বিচার। আর পুরুষেরা ওরকম চেঁচাবেই;—কারণ তারা দেখে আস্‌ছে যে সেই মান্ধাতার আমল থেকে শুধু মেয়েরাই কাটা পড়েছে তাদের দোষের জন্যে। মেয়েরা পেথম্ পেথম্ এই পুরুষদের মতই চেঁচিয়ে উঠেছিল কি না এই অবিচারে, তা আমি জানি না। তবে ক্রমে তাদের ধা'তে যে এ খুবই সয়ে গিয়েছে এ নিশ্চয়। আমি যদি ঐ রকম একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসতুম আর যদি আমার সোয়ামী ঐ জন্যে আমাকে কেটে ফেল্‌ত তাহ'লে পুরুষেরা একটি কথাও বলত না। তাদের সঙ্গে মেয়েরাও বল্‌ত, "হাঁ ও-রকম খারাপ মেয়েমানুষের ঐ রকমেই মরা উচিত!" কারণ তারাও বরাবর দেখে আস্‌ছে, পুরুষদের সাত খুন মাফ।

"তা ছাড়া, আমি মানুষের দেওয়ার চেয়ে অনেক বড় শাস্তি পেয়েছিলুম নিজের মনের মাঝে। আমার জ্বালাটা যে সদা সর্ব্বদা কি রকম মোচ্‌ড়ে মোচ্‌ড়ে উঠ্‌ত তা কে বুঝ্‌ত বল্‌ দেখি বুন্‌? নিজে হাত কাট্‌লেও সেত ছিল আমার নিজেরই সোয়ামী! কোন্‌ জজ নাকি তাঁর নিজের ছেলের ফাঁসির হুকুম দিয়েছিলেন, তা হ'লেও—অত শক্ত হ'লেও—তাঁর বুকে কি একটুকুও লাগে নাই ঐ হুকুমটা দিবার সময়?—আহা, যখন তার বুকে বসে একটা পেরকাণ্ড রাক্ষসীর মতই তার গলায় দা-টা চেপে ধরলুম্, তখন আঃ, কি মিনতি ভরা গোঙানিই তার গলা থেকে বেরোচ্ছিল! চোখে কি সে একটা ভীত চাউনি আমার ক্ষমা চাইছিল।—আঃ! আঃ!

"জেলে রাত্তিরদিন কাজের মধ্যে ব্যস্ত থেকে কোন কিছু ভাব্‌বার সময় পেতুম না। মনটাকে ভাববারই সে সময় দিতুম না। কাজের উপর কাজ চাপিয়ে তাকে এত বেশী জড়িয়ে রাখতুম যে, শেষে কখন যে ঘুম এসে, আমাকে অবশ করে দিয়ে যেত, তা বুঝ্‌তেই পারতুম্‌ না। এখন, যেদিন ছাড়া পেলুম, সে দিন আমার সমস্ত বুকটা কিসের কান্নায় হা হা করে' চেঁচিয়ে উঠ্‌ল! এতদিন যে বেশ ছিলুম এই জেলের মাঝে! এতদিন আমার মনটা যে খুব শান্ত ছিল! এখন এই ছাড়া পেয়ে আমি যাই কোথা? ওঃ ছাড়া পাওয়ার সে কি বিষের মতন জ্বালা!

"ঘরেই এলুম!—দেখ্‌লুম আমার ছেলে বে করেছে। বেশ টুক্‌টুকে মেণীপরা বৌটি! আমি ফিরে এসেছি শুনে' গাঁয়ের লোকে 'হাঁ হাঁ' করে ছুটে' এল; বল্‌লে "গাঁয়ে এবার মড়কচণ্ডি হবে! বাপ্‌রে সাক্ষাৎ তাড়কা রাক্ষসী এবার গাঁয়ে ফিরে এসেছে, এবার

আর রক্ষা নাই—নিঘ্‌ঘাত যমালয়!—" পেথম্ পেথম্ আমি তাদের কথায় কাণ দিতুম না। মনে করলুম, "কাণ করেছি ঢোল, কত বল্‌বি বল্।" শেষে কিন্তু আর কাণ না দিয়েও যে আর পারলুম না। তাদের বলার মাঝে যে একটুও থামা ছিল না! যেন কিছুই হয় নাই এই ভেবে আমি আমার বৌ বেটা নিয়ে ঘর সংসার নতুন করে' পাতালুম, লোকে তা লণ্ডভণ্ড করে' দিলে। মেয়ের বিয়ে দিতে চাইলুম, কেউ বিয়ে কর্‌লে না, বল্‌লে, "রাক্ষুসীর মেয়ে রাক্ষুসী হবে এ ডাহা সত্যি কথা।" এতদিন যে বেথাটা আমি দুহাত দিয়ে চাপা দিতে চাইছিলুম, সেইটাই দেশের লোক উস্‌কে উস্‌কে বের করে' চোখের সাম্‌নে ধরতে লাগল। সোনার চাঁদ ছেলে আমার একটি কথাও শুন্‌লে না,—আমার যে কেমন করে' কি হ'ল তা ভুলেও কোন কথার মাঝে জিজ্ঞেস্ কর্‌লে না, খুসী হয়েই আমাকে সংসারের সব ভার ছেড়ে দিলে, কেন না সে বুঝেছিল যা গিয়েছে তার খেসারতের জন্যে আর একজনকে হারাব কেনে! আর এই কড়ুই রাঁড়ী আঁটকুড়িরা যারা আমার সাত পুরুষের গিয়াত্ কুটুম নয়, তারা কিনা রাত্তির দিন খেয়ে না খেয়ে লেগে' গেল আমার পেছনে! দেবতাদের শাপের মত এসে আমাদের সব সুখশান্তি নষ্ট করে দিলে!—আমার ছেলেকে তারা একঘরে পতিত করলে, তাতেও তাদের সাধ মিট্‌ল না। নানান্ পেকারে—নানান্ ছুঁতোয় এই দুটো বছর ধরে' কি না কষ্টই দিয়েছে এই গাঁয়ের লোকে! দিদি, পথের কুকুরকেও এত ঘেন্না হেনস্থা করে না! এতে যে ভাল মানুষেরই মাথা বিগড়ে যায়, আমার মত শতেক-খুয়ারী ডাইনী রাক্ষুসীর ত কথাই নাই! তাও দিদি খুবই সয়ে থাকি, নিতান্ত বিরক্ত না করে' তুললে ওদের গাল মন্দ দিই না

বত্রিশ নাড়ি পাক দিলে তবে কখনো লোকের মুখ দিয়ে 'শাপমন্যি' বেরোয়!

"এখন ত তুই সব শুন্‌লি দিদি, এখন বল, দোষ কার? আর তুই ঐ হাতের মাল্‌সাটা আমার মাথায় ভেঙ্গে আমার মাথাটা চৌচির করে' দে—সব পাপের শাস্তি হোক্!—ওঃ ভগবান!!"

"সা লে ক"

"সালেক"

(ক)

আজকার প্রভাতের সঙ্গে শহরে আবির্ভূত হয়েছেন এক অচেনা দরবেশ। 'সাগরমন্থনের মত হুজুগে' লোকের কোলাহল উঠেছে পথে, ঘাটে, মাঠে,—বাইরের সব যায়গায়। অন্তঃপুরচারিণী অসূর্য্যম্পশ্যা জেনানেদের হেরেম্ তেমনি নিস্তব্ধ নীরব,—যেমন রোজই থাকে দুনিয়ার সব কলরব হ-য-ব-র-ল'র একটেরে! বাইরে উঠ্‌ছে কোলাহল —ভিতরে ছুট্‌ছে স্পন্দন!

সবারই মুখে এক কথা, "ইনি কে? যাঁর এই আচম্‌কা আগমনে নূতন করে' আজ নিশিভোরে উষার পাখীর বৈতালিক গানে মোচড় খেয়ে খেয়ে কেঁপে উঠ্‌ল আগমনীর আনন্দ-ভৈরবী আর বিভাস?"

ছুটেছে ছেলে মেয়ে বুড়ো সবই একই পথে ঘেঁসাঘেঁসি ক'রে দরবেশকে দেখ্‌তে। তবুও দেখার বিরাম নাই। দুঃশাসন টেনেই চলেছে কোন্ দ্রৌপদীর লজ্জাভরণ এক মূক বিস্ময়-বিস্ফারিত-অক্ষি বিশ্বের চোখের সুমুখে, আর তা' বেড়েই চলেছে! তার আদিও নেই, অন্তও নেই। ওগো, অলক্ষ্যে যে এমন একটি দেবতা রয়েছেন, যিনি গোপনের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করেন না।

দরবেশ কথাই কয় না,—একেবারে চুপ!

অনেকে বায়না ধর্‌লে, দীক্ষা নেবে; দরবেশ ধরা-ছোঁয়াই দেয় না। যে নিতান্তই ছাড়ে না, তাকে বলে, "কাপড় ছেড়ে আয়!" সে ময়লা

কাপড় ছেড়ে খুব 'আমিরানাশানের' জামা জোড়া পরে' আসে। দরবেশ শুধু হাসে আর হাসে, কিছুই বলে না।

সহরের কাজী শুন্‌লেন সব কথা। তিনিও ধন্না দিতে সুরু কর্‌লেন দরবেশের কাছে! দরবেশ যতই আমল দিতে চায় না, কাজী সাহেব ততই নাছোড়বন্দী হয়ে লেগে থাকেন। দরবেশ বুঝ্‌লেন এ ক্রমে "কম্‌লিই ছোড়্‌তা নেই" গোছের হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাঁর মুখে ফুটে উঠ্‌ল ক্লান্ত সদয় হাসির ঈষৎ রেখা।

(খ)

দরবেশ বল্‌লেন, "শুন কাজী সাহেব, আমি যা বল্‌ব তাই কর্‌তে পারবে?" কাজী সাহেব আস্ফালন করে' উঠ্‌লেন "হাঁ হুজুর বান্দা হাজির।"

দরবেশ হাস্‌লে, তারপর বল্‌লে, "দেখ, কাল জুম্মা মুল্লুকের বাদশা' আসছেন এখানে। নামাজ পড়্‌বার সময় তোমায় 'ইমামতি' কর্‌তে বল্‌বেন। তুমি সেই সময় একটা কাজ কর্‌তে পারবে?" কাজী সাহেব বলে' উঠলেন, "আলবৎ হুজুর, আলবৎ! কি কর্‌তে হ'বে?"

দরবেশ বল্‌লে, "তোমার দুবগলে দুটি মদের বোতল দাবিয়ে নিয়ে যেতে হবে, তারপর যেই নামাজে দাঁড়াবে, অম্নি মদের বোতল দুটি দিব্যি 'জায়নামাজের' উপর ভেঙ্গে দেবে!"

কাজী সাহেবের মুখ হয়ে গেল ভয়ে নীল! কাঁপতে কাঁপতে বল্‌লেন, "হুজুর, তাহ'লে আপনি আমা হ'তে মুক্তি পাবেন সত্যি কেননা ওর পরেই আমার মাথা ধড় হ'তে আলাদা হয়ে যাবে,—কিন্তু আমার মুক্তি হবে কি?"

দরবেশ বল্‌লেন, "অনেককেই ভব-যন্ত্রণা হ'তে মুক্তি দিয়েছ তুমি, একবার নিজের মুক্তিটাও ত দেখ্‌তে হবে!"

কাজী সাহেব চলে' এলেন। ভাব্‌লেন "যা থাকে অদৃষ্টে, কাল নিয়ে যাওয়া যাবে দুটো মদের বোতল মস্‌জিদে। দরবেশ নিশ্চয়ই আমার চেয়ে বেশী জানে!"

(গ)

বাদশাহ্ এসেছেন। সঙ্গে আছে সেনা-সামন্ত উজির-নাজির সব! জুম্মার নামাজ হচ্ছে। "এমাম" (আচার্য্য) হয়েছেন কাজী সাহেব। একটু পরেই কাজী সাহেবের বগলতলা হ'তে খসে' পড়্‌ল দুটি ধেনো মদের বোতল! আর এটা বলাই বাহুল্য যে, সে বোতল সশব্দে বিদীর্ণ হয়ে যে বিশ্রী গন্ধে মস্‌জিদ ভরিয়ে তুল্‌লে' তাতে সকলেই একবাক্যে সমর্থন কর্‌লে যে, কাজী সাহেবের মত মাতাল আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে হয়নি, হবেও না! যে মদ খায় তার ক্ষমা আছে, কিন্তু যা'কে মদে খায় তার ক্ষমাও নেই, নিস্তারও নেই।

বৈঠকে বস্‌ল, এ অসমসাহসিক মাতালের কি শাস্তি দেওয়া দরকার। উজির ছাড়া সভাস্থ সকলেই বললে, "এর আর বিচার কি জাঁহাপনা? শূলে চড়ানো হোক্!" মন্ত্রী উঠে বললেন, "এ বান্দার গোস্তাখী মাফ কর্‌তে আজ্ঞা হয় হুজুর। আমার বিবেচনায় এর মত পাপিষ্ঠলোকের মৃত্যুদণ্ড উপযুক্ত শাস্তি নয়। সব চেয়ে বেশী শাস্তি দেওয়া হবে যদি তা'র পদ আর পদবী কেড়ে' নেন, আর যা কিছু সম্পত্তি তা বাজেয়াপ্ত করে' নেন। মৃত্যুদণ্ড হ'লে ত সব ল্যাঠা চুকেই গেল কিন্তু এই যে তার জীবনব্যাপী লাঞ্ছনা আর গঞ্জনা, তা তা'কে তিলে তিলে দগ্ধ করে

মারবে।" বাদশা সমেত সভাস্থ সকলেই হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌লেন, "তাই ভাল।"

পাশ দিয়ে উড়ো খইয়ের মত একটা পাগলা যা তা বকে যাচ্ছিল, "এই সব লাঞ্ছনা আর গঞ্জনাই ত চন্দন! আর ওতে কিছু দগ্ধ হয় না ভাই, স্নিগ্ধই হয়।"

(ঘ)

বাদশার দরবারে কাজী সাহেব যখন এই রকম লাঞ্ছিত অপমানিত হ'য়ে, সব হারিয়ে একটা অন্ধকার গলির বাঁকে দাঁড়ালেন, তখন তাঁর দুর্দ্দশা দেখে পথের কুকুরও কাঁদে! "হাতী আড় হ'লে চাম্‌চিকেও লাথি মারে।" তিনি যখন সহরের কাজী ছিলেন, তখন হয়ত ন্যায়ের জন্যেও যাদিগে শাস্তি দিয়েছিলেন, তারাই সময় পেয়ে উত্তম মধ্যম প্রহারের সঙ্গে জানিয়ে দিলে যে চিরদিন কারুর সমান যায় না। আর যা'দিগে অবিচার করে' শাস্তি দিয়েছিলেন, তার প্রতিশোধ নিলে তারা যে রকম নিষ্ঠুরভাবে, তা'র চেয়ে শূলে চড়ে' মৃত্যুও ছিল শ্রেয়ঃ।

এত লাঞ্ছনা আর গঞ্জনার মধ্যেও সে কা'র স্নিগ্ধ সান্ত্বনা ছুঁয়ে গেল আচম্‌কা এসে, ঠিক যেন জ্বরের কপালে বাঞ্ছিতা প্রেয়সীর গাঢ় করুণ পরশের মত! কাজী সাহেব বুকের শুক্‌নো হাড়গুলোকে আঁক্‌ড়ে' ধরে' কেঁদে উঠ্‌লেন, "খোদা, এম্‌নি করে আমার সকল অহঙ্কার চোখের জলে ডুবিয়ে দিলে!"

"ওগো দরবেশ কোথায় তুমি? কোন্ সুদূরের পারে?"

তারপর সেই সন্ধ্যায় সরীসৃপের মত বুকের উপর ভর দিয়ে অতি কষ্টে কাজী সাহেব যখন তাঁর বাঞ্ছিত পথ বেয়ে দরবেশের আস্তানায়

এসে পঁহুচ্‌লেন, তখন একটা শান্ত ঘুমের সোহাগভরা ছোঁওয়ার আবেশে আঁখির পাতা জড়িয়ে আস্‌ছে! তবুও একবার প্রাণপণে অর্ত্তনাদ করে উঠ্‌লেন, "দরবেশ, দীক্ষিত কর।—আমি এসেছি, আর যে সময় নাই!"

পূরবীর মীড়ে, সন্ধ্যা গোধূলির সম্মিলনে যে একটা ব্যথার কাঁপুনি বয়ে গেল, তা' কেউ লক্ষ্য কর্‌লে না।

কা'র শান্তশীতল ক্রোড় তাঁহাকে জানিয়ে দিলে, "এই যে বাপ! এস! এখন তোমার মলিন বস্ত্র আর মলিন অহঙ্কার সব চোখের জলে ধুয়ে সাফ হয়ে গেছে!"

দরবেশ সুরবাহারটায় ঝঙ্কার দিয়ে গেয়ে উঠ্‌লেন,

"বমে সাজ্জাদা রঙ্গিন্ কুন্ গরৎ পীরে মাগাঁ গোয়েদ।
কে সালেক বেখবর না বুদ্ জেরাহোরস্‌মে মঞ্জেল হা।"
"জায়নামাজে শারাব-রঙীন্ কর্, মুর্শেদ বলেন যদি।
পথ দেখায় যে, জানে সে সে পথের কোথায় অন্ত আদি।"

সৎমা-তাড়ানো মাতৃহারা মেয়ের মত অশ্রু আর অভিমান-আর্দ্র-মুখে একটা ভারী কালো মেঘ সব ঝাপ্‌সা, ক্রমে অন্ধকার ক'রে দিলে।

কাজী সাহেব প্রাণের বাকী সমস্ত শক্তিটুকু একত্র করে' ভাঙা গলায় বল্‌লেন, "কে? ওগো পথের সাথী! তুমি কে?"

অনেকক্ষণ কিছুই শোনা গেল না! নদীর নিস্তব্ধ তীরে তীরে দুলে' গেল আর্ত্ত-গম্ভীর প্রতিধ্বনি, "তু—মি—কে?"

খেয়াপার হ'তে খুব মৃদু একটা আওয়াজ কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে কয়ে গেল, "মাতাল হাফিজ!"

স্বামীহারা

স্বামীহারা

(ক)

"ওঃ! কি বুক-ফাটা পিয়াস! সলিমা! 'একটু পানি' খাওয়াতে পারিস্ বোন্? আমার কেন এমন হ'ল, আর কি করে'ই এ কপাল পুড়্‌ল, তাই জিজ্ঞেস কর্‌ছিস্—না? তা আমার সে 'দরেগ'-মাখা 'রোনা' শুনে' আর কি হবে বহিন্। দোওয়া করি, তুই চির- এয়োতি হ'! এ সব পোড়াকপালীর কথা শুন্‌লেও যে তোদের অমঙ্গল হ'বে ভাই! খোদা যেন মেয়েদের বিধবা কর্‌বার আগে মরণ দেন, তা না হলে তাদের বে' হবার আগেই যেন তারা 'গোরে' যায়! তোর যদি মেয়ে হয় সলিমা, তা'হলে তখ্‌খনি আঁতুড় ঘরেই নুন খাইয়ে মেরে" দিস্, বুঝলি? নৈলে চিরটা কাল আগুনের খাপ্‌রা বুকে নিয়ে কাল কাটা'তে হবে।

"তুই ত আজ দশ বছর এ গাঁ ছাড়া, তাই সব কথা জানিস না। সেই ছোট্টটি গিয়েছিল, আজ একেবারে খোকা কোলে ক'রে বাপের বাড়ী এসেছিস্!....আমি পাগল হ'য়ে গেছি ভেবে সবাই দূর হ'তে দেখেই পালায়। আচ্ছা তুইত জানিস্ ভাই আমায়, আর এখনও ত দেখ্‌ছিস্, সত্যি বল্‌ত আমি কি পাগল হ'য়েছি? হাঁ ঠিক বলেছিস্, আমি পাগল হইনি,—নয়?

"সে বার—ঠিক মনে পড়ে না সে কতকাল আগে—বিধাতার অভিশাপ যেন কলেরা আর বসন্তের রূপ ধরে' আমাদের ছোট্ট শান্ত গ্রামটির উপর এসে পড়েছিল, আর ঐ অভিশাপে পড়ে' কত মা, কত

ভাই বোন, কত ছেলে মেয়ে যে গাঁয়ের ভরাবক্ষে শুধু একটা খাঁ খাঁ মহাশূন্যতা রেখে' কোন্ সে অচিন্ মুল্লুকে উধাও হ'য়ে গেল তা মনে পড়্‌লে—মাগো মা—জানটা যেন সাতপাক খেয়ে মোচড় দিয়ে ওঠে। কত যে ঘরকে ঘর উজাড় হ'য়ে তাতে তালাচাবি পড়্‌ল—আর গ্রামে যেমন এক একটি ক'রে ভিটেনাশ হ'তে লাগল, তেমনি এই গোরস্থানে গোরের সংখ্যা এত বেশী বেড়ে' উঠ্‌ল যে, আর তার দিকে তাকানই যেত না।

"আচ্ছা ভাই, এই যে দীঘির গোরস্থান, আর এই যে হাজার হাজার কবর, এগুলো কি তবে আমাদেরই গাঁয়ের একটা নীরব মর্ম্মন্তুদ বেদনা—অন্তঃসলিলা ফল্গুনিঃস্রাব—জমাট বেঁধে' অমন গোর হ'য়ে মাটি ফুঁড়ে ফুঁড়ে বেরিয়েছে? না কি আমাদের মাটির মা তাঁ'র এই পাড়াগেঁয়ে চিরদরিদ্র জরাব্যাধি-প্রপীড়িত ছেলেমেয়েগুলির দুঃখে ব্যথিত হ'য়ে করুণ প্রগাঢ় স্নেহে বিরাম-দায়িনী জননীর মত মাটির আঁচলে ঢেকে বুকের ভিতর লুকিয়ে রেখেছেন? তাঁ'র এই মাটির রাজ্যে ত দুঃখ ক্লেশ বা কারুর অত্যাচার আস্‌তে পারে না! এখানে শুধু একটা বিরাট অনন্ত সুপ্তশান্তি—কর্ম্মক্লান্ত মানবের নিসাড় নিস্পন্দ সুষুপ্তি! এ একটা ঘুমের দেশ, নিঝুমের রাজ্যি! আহা, আজ সে কত যুগের কত লোকই যে এই গোরস্থানে ঘুমিয়ে আছে তা এখন গাঁয়ের কেউ বল্‌তে পার্‌বে না! আমি আর কতজনকেই বা মরতে দেখ্‌লুম? এরা যখন মরে'ছিল, আমি তখন হয়ত' এমনি একটা অ-দেখার 'কোকাফ মুল্লুকে' ঘুরতেছিলুম, তারপর যখন আমায় কে এই দুনিয়ায় এনে' ফেলে' দিলে—আর দুনিয়ার এই আলোকের জ্বালাময় স্পর্শে আমার চক্ষু

ঝল্‌সে গেল, তখন আমি নিশ্চয় অব্যক্ত অপরিচিত ভাষায় কেঁদে উঠেছিলুম, "ওগো, এ মাটির—পাথরের দুনিয়ায় কেন আমায় আন্‌লে? কেন ওগো কেন?"—তারপর মায়ের কোলে শুয়ে যখন তাঁ'র দুধ খেলুম, তখন প্রাণে কেমন একটা গভীর সান্ত্বনা নেমে' এল! আমি আমার সমস্ত অতীত এক পলকে ভুলে' গিয়ে ঘুমিয়ে পড়্‌লুম।

"ঐ যে বাঁধানো কবরগুলো, ওগুলো অনেক কালের পুরাণো। তখন ছিল বাদশাহী আমল, আর আমাদের এই ছোট্ট গ্রামটাই ছিল "ওলীনগর" বলে একটা মাঝারি গোছের সহর। ঐ যে সাম্‌নে 'রাজার গড়' আর 'রাণীর গড়' বলে' দুটো ছোট্ট পাহাড় দেখতে পাচ্ছ, ওতেই থাক্‌তেন তখনকার রাজা রাণী—রাজকুমার আর রাজকুমারীরা। লোকে বলে, তাঁরা শুতেন হীরার পালঙ্কে, আর খেতেন 'লাল জওয়াহের'। আর, কবর-স্থানের পশ্চিমদিকে ঐ যে পীর সাহেবের 'দরগা' ওরই 'বর্দ্দোয়ায' নাকি এমন সোণার সহর পুড়ে' ঝাও হয়ে যায়। সেই সঙ্গে রাজার ঘরগুষ্টি সব পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে, আজ তাঁর বংশে বাতি দিতে কেউ নেই। পশ্চিমে-হাওয়ায় তাঁদের সেই ছাই-হওয়া দেহ উড়ে' উড়ে' হয়ত এই গোরস্থানের উপর এসে' পড়েছে। আচ্ছা ভাই, খোদার কি আশ্চর্য্য মহিমা! রাজা—যার অত ধন, মালমাত্তা, অতপ্রতাপ, সেও মরে' মাটি হয়, আর যে ভিখারী খে'তে না পেয়ে তালপাতার কুঁড়েতে কুঁক্‌ড়ে মরে' পড়ে' থাকে, সেও মরে' মাটি হয়! কি সুন্দর যায়গা এ তবে বোন্‌!

তুই ঠিক বলেছিস্‌ ভাই সলিমা, কেঁদে কি হবে, আর ভেবেই বা কি হ'বে! যা হ'বার নয় তা হ'বে না, যা পা'বার নয় তা পা'ব না। তবু পোড়া মন ত মান্‌তে চায় না। এই যে একা কবরস্থানে এসে কত

রাত্তির ধরে শুধু কেঁদেছি কিন্তু এত কান্না এত ব্যাকুল আহ্বানেও ত কই তাঁর একটুকু সাড়া পাওয়া গেল না। তিনি কি এতই ঘুমুচ্ছেন? কি গভীর মহানিদ্রা সে? আমার এত বুকফাটা কান্নার এত আকাশচেরা চীৎকারের এতটুকু কি তাঁর কাণে গেল না? সে কোন্ মায়াবীর মায়াযষ্টিস্পর্শে মোহনিদ্রায় বিভোর তিনি? আমিও কেন অম্‌নি জড়ের মত নিঃসাড়নিষ্পন্দ হয়ে পড়ি না? আমারও প্রাণে কেন মৃত্যুর ঐ রকম শান্তশীল ছোঁ'ওয়া লাগে না? আমিও কেন দুপুর রাতের গোরস্থানের মতই নিথর নিঝুম হয়ে পড়ি না? তা হ'লে ত এ প্রাণপোড়ানো অতীতটা জগদ্দলশিলার মত এসে' বুকটা চেপে' ধরে না! সেই সে কোন্-ভুলে-যাওয়া-দিনের কুলিশকঠোর স্মৃতিটা তপ্তশলাকার মত এসে এই ক্ষত বক্ষটায় ছ্যাকা দেয় না। জোবেহ্' করা জানোয়ারের মত আর কতদিন এ নিদারুণ জ্বালায় ছট্‌ফট্ ক'রে মর্‌ব? কেন মৃত্যুর মাধুরী মায়ের আশীষধারার মত আমার উপর নেমে' আসে না? এ হতভাগিনীকে জ্বালিয়ে কার মঙ্গল সাধন কর্‌ছেন মঙ্গলময়? তাই ভাবি,—আর ভাবি,—কোন কূলকিনারা পাই না, এর যেন আগাও নেই, গোড়াও নেই। কি ছিল—কি হ'ল,—এ শুধু একটা বিরাট গোলমাল!

"সেদিন সকালে ঐ পাশের চারাধানের ক্ষেতের আ'লের উপর দিয়ে কাঁচা আম খে'তে খে'তে একটি রাখাল বালক কোথা হ'তে শেখা একটা করুণ গান গে'য়ে যাচ্ছিল। গানটা আমার মনে নেই, তবে তার ভাবার্থটা এই রকম, "কত নিশিদিন সকাল সন্ধ্যা হ'য়ে গেল, কত বারমাস কত যুগযুগান্তরের অতীতে ঢ'লে পড়ল, কত নদনদী সাগরে গিয়ে মিশল, আবার কত সাগর শুকিয়ে মরুভূমি হ'য়ে গেল,

কত নদী পথ ভুলে' গেল, আর সে কত গিরিই না গলে' গেল, তবু ওগো বাঞ্ছিত, তুমি তো এলে না!" গানটা শুন্‌ছিলুম আর ভাবছিলুম, কি ক'রে আমার প্রাণের ব্যাকুল কান্না এমন করে' ভাষায় মূর্ত্ত হ'য়ে আত্মপ্রকাশ কর্‌ছিল? ওগো, ঠিক এই রকমই যে একটা মস্ত অসীম কাল আমার আঁখির পলকে পলকে যেন কোথা দিয়ে কোথায় চলেছে, আর আমি কা'কে পাবার—কি পাবার জন্যে শুধু আকুলিবিকুলি মিনতি করে ডাকছি, কিন্তু কই তিনি ত এলেন না—একটুকু সাড়াও দিলেন না। তবে দুপুর রোদ্দুরে ঘুনঘুণে মাছির মুখে ঐ যে খুব মিহি করুণ 'গুণ্‌গুণ্' স্বর শুনি এই গোরস্থানে, ওকি তাঁরই কান্না? দিনরাত ধরে সমস্ত গোরস্থান ব্যেপে প্রবল বায়ুর ঐ যে একটানা হু হু শব্দ, ওকি তাঁরই দীর্ঘশ্বাস? রাত্তিরে শিরীষফুলের পরাগমাখা ঐ যে ভেসে, আসে ভারি গন্ধ, ওকি তাঁরই বর অঙ্গের সুবাস? গোরস্থানের সমস্ত শিরীষ, শেফালি আর হেনার গাছগুলি ভিজিয়ে, সবুজ দুর্ব্বা আর নীল ভূঁই-কদমের গাছগুলিকে আর্দ্র করে' ঐ যে সন্ধ্যে হ'তে সকাল পর্য্যন্ত শিশির ঝরে, ওকি তাঁরই গলিত বেদনা? বিজুলির চমকে ঐ যে তীব্র আলোকচ্ছটা চোক ঝলসিযে দেয়, ওকি তাঁরই বিচ্ছেদ-উন্মাদ হাসি? সৌদামিনী-স্ফুরণের একটু পরেই ঐ যে মেঘের গম্ভীর গুরু গুরু ডাক শুনতে পাই, ওকি তার পাষাণবক্ষের স্পন্দন? প্রবল ঝঞ্ঝার মত এসে' সময় সময় ঐ যে দম্‌কা বাতাস আমাকে ঘিরে তাণ্ডবনৃত্য করতে থাকে, ওকি তাঁ'রই অশরীরি ব্যাকুল আলিঙ্গন? গোরস্থানের পাশ দিয়ে ঐ যে 'কুমুর' নদী ব'য়ে যাচ্ছে, আর তা'র চরের উপর প্রস্ফুটিত শুভ্র কাশফুলের বনে বনে দোল্‌দোলা দিয়ে ঘনবাতাস শন্ শন্ করে ডেকে' যাচ্ছে, ওকি তাঁরই কম্পিতকণ্ঠের আহ্বান? আমি কেন

ওঁরই মত অম্‌নি অসীম, অম্‌নি বিরাট-ব্যাপ্ত হয়ে ওঁকে পাই না? আমি কেন অমনি সবারই মাঝে থেকে ঐ অপাওয়াকে অন্তরে অন্তরে অনুভব করি না? এ সীমার মাঝে অসীমের সুর বেজে উঠবে সে আর কখন্? এখন যে দিন শেষ হ'য়ে এল, ঐ শুন নদীপারের বিদায়গীত শুনা যাচ্ছে খেয়াপারের ক্লান্ত মাঝির মুখে—

"দিবস যদি সাঙ্গ হ'ল, না যদি গাহে পাখী,
ক্লান্ত বায়ু না যদি আর চলে,—
এবার তবে গভীর করে' ফেলগো মোরে ঢাকি
অতি নিবিড় ঘন তিমির তলে!"

(খ)

'এই যে গোরস্থান, যেখানে আমার জীবনসর্ব্বস্ব দেবতা শু'য়ে র'য়েছেন, শৈশব হ'তে এই যায়গাটাই ছিল আমার সব চেয়ে প্রিয়স্থান। ঐ যে অদূরে ছোট ছোট তিনটি কবর দেখতে পা'চ্চ প্রায়ই মাটির সঙ্গে মিশে সমান হ'য়ে গেছে, আর উপরটা কচি দুর্ব্বা ঘাসে ছে'য়ে ফেলেছে, ওগুলি আমার ছোট ভাই বোনেদের কবর! ওরা খুব ছোটতেই মারা গিয়েছিল—আমের কচি বৌল ফাগুনের নিষ্ঠুর করকাস্পর্শে ঝরে' পড়ে'ছিল। ওই যে ওদের শিয়রে বকম্ ফুলের গাছগুলি দেখতে পাচ্ছ, ওগুলি আমিই লাগিয়েছিলুম, আমি তখন খুবই ছোট। এখন অযতনে বোয়ান ঝোঁপ আর আলগা লতায় ও যায়গাটা ভরে উঠেছে। আগে ওদের কবরের উপর ওদেরই মত কোমল আর পবিত্র বকম্ ও শিরিষ ফুলের হল্‌দে' রেণু ঝরে' পড়্‌ত সারা বসন্ত আর শরৎকালটা

ধরে' আর তার চেয়েও বেশী ঝরে' পড়্‌ত ঐ তিনটি ক্ষুদ্র সঙ্গীদের বিচ্ছেদ-ব্যথিত অন্তর-দরিয়া মথিত ক'রে আকুল অশ্রুর পাগলা-ঝোরা! বাবা আমার মাকে ধরে' ধরে' নিদাঘের বিষাদগভীর সন্ধ্যায় এই সরু পথ বেয়ে নিয়ে যেতেন, আর আমাদের 'টুনু'র, 'তাহেরা'র আর 'আবুলে'র ঘাসে চাপা ছোট কবরগুলি দেখিয়ে বল্‌তেন, "এইখানে তারা ঘুমিয়ে আছে, তা'রা আর উঠে আস্‌তে পারে না। অনেক দিন বাদে আমরাও সব এসে' ওদেরই পাশে শু'ব,—আমাদেরও অম্‌নি মাটির ঘর তৈরী ক'রে দেবে গাঁয়ের লোকে।" সেই সময় সেই বেদনাপ্লুত বিয়োগ-বিধূর সন্ধ্যায় কি একটা আবছায়া আবেশ-তরুণ সুরে যে আমার সারা বক্ষ ছে'যে ফেল্‌ত, তা' প্রকাশ কর্‌তে পার্‌তুম না, তাই বাবার মুখের দিকে চেয়ে কি জানি কেন ডুক্‌রে কেঁদে উঠ্‌তুম। বাবা অপ্রতিভ হ'য়ে আমাকে কোলে তুলে নিয়ে তাঁর স্নিগ্ধ-কোমলস্পর্শে সান্ত্বনা দিতেন। সেই থেকে যায়গাটার উপর আমার এত মায়া জন্মে গেছিল যে, আমি রোজ মাকে লুকিয়ে এখানে পালিয়ে এসে আমার ভাই বোন্‌দের ঐ ছোট্ট তিনটি কবরের দিকে ব্যাকুল বেদনায় চেয়ে থাকতুম!—আচ্ছা ভাই, রক্তের টান কি এত বেশী? যেখানে আমার কচি ভাই বোন্‌-গুলির ফুলের দেহ মাটির সঙ্গে মিশে মাটি হ'য়ে গেছে, সেই ভীষণ করুণ যায়গাটি দেখবার জন্যেও প্রাণে এমন ব্যাকুল আগ্রহ উপস্থিত হ'ত কেন? শুনেছি যে যায়গাটার মাটি নিয়ে খোদা আমাদের 'পয়দা' করেন, নাকি ঠিক সেই যায়গাতেই আমাদের কবর হয়, আর তাই আমরা স্বতঃই কেমন একটা নিবিড় টান অন্তরের অন্তরে অনুভব করি। এখন 'তাহেরা'র কবরটি যেমন ধসে' প'ড়েছে আর ওর মধ্যে একটি

ধলা হাড় দেখা যাচ্ছে, হয়ত সে কত বছর বাদে আমারও কবর এরকম ধসে যা'বে আর আমার বিশ্রী হাড়গুলো উলঙ্গ মূর্ত্তিতে প্রকট হ'য়ে লোকের ভয়োৎপাদন কর্‌বে!—হায়রে মানুষের পরিণতি, তবু মানুষ এত অহঙ্কার করে কেন আমি তাই ভাবি—আর ভাবি। আবার দু-এক সময় মনে হয় সুন্দর পৃথিবীটা ছেড়ে' সে কোন্ অজানা দেশে চলে' যেতে হ'বে, মনে হ'লে জানটা যেন গুরুবেদনায় টন্ টন্ করে' ওঠে, পৃথিবীর প্রতি একি অন্ধ মূঢ় নাড়ীর টান আমাদের? তারপর বাবাও 'আবুলে'র পাশে গিয়ে শয়ন কর্‌লেন, বড় ঝোপের পাশের ঐ বড় কবরটা বাবার। বাবা মরে' যাবার পর আমি আরও বেশী করে' কবরস্থানে যেতুম, স্তব্ধ হয়ে বসে রইতুম আমার হারিয়ে যাওয়া বন্ধুদের মৌন সাদরের ভাষা শুন্‌ব বলে; একটা নিবিড় বেদনায় চোখের পাতা ভরে উঠ্‌ত। এই সব বেদনা, অপমান, দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে মা আমার দিন দিন রুগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। উপর্য্যুপরি এত আঘাত তিনি আর সইতে পারছিলেন না। ক্রমে তাঁকে ভীষণ যক্ষ্মারোগে ধর্‌ল। আমি বুঝলুম আমার কপাল পুড়েছে, মাও আমায় ছেড়ে' চলেছেন, তাঁর ডাক পড়ে'ছে। আমি আমার ভবিষ্যতের দিকে তাকাতেও সাহস কর্‌লুম না,—উঃ সে কি সূচিভেদ্য অন্ধকার!

"এমন সময় একদিন সন্ধ্যায় সইমা আমাদের ঘরে এসে' মা'র শীর্ণ হাতটি নিজের হাতে নিয়ে বল্‌লেন, "সই, আমার ছেলে গরমের ছুটিতে বাড়ী এসেছে। সে তোদের দোওয়াতে এবার খুব সম্মানের সঙ্গে বি, এ, পাশ করে'ছে। এবার ছেলের বিয়েটা দিয়ে বৌকে সংসার বুঝিয়ে দিয়ে সংসার হ'তে সরে পড়ি। আর তা ছাড়া একা ঘর, বৌ নেই, বেটী নেই, দিন রাত ঘরটা যেন পোড়োবাড়ীর

মত খাঁ খাঁ করছে। খোদা ত দেননি আমায়, যে দু'দিন জামাই-বেটী নিয়ে সাধ-আহ্লাদ করব। ছেলে এতদিন জেদ ধরেছিল বি, এ, পাশ করে বিয়ে। তা খোদা তার ইচ্ছা পূর্ণ করে' দিয়েছেন। এতদিন আমার ছেলে বে' করলে দু একটি খোকা খুকী হত না কী তার ঘরে? আর আমারও ঘরটা তা হলে অনেক মানাত, তা যখনকার তখন না হ'লে তোর আমার কথায় ত কিছু হয় না। আমার হাতের কাছে লক্ষ্মী শান্ত মা আমার—হীরের টুক্‌রো বৌ থাকতে আবার কোন্ গরীবের বেটীকে আন্‌তে যাব ঘরে," বলেই আমার মাথাটা সস্নেহে তাঁর বুকের মধ্যে টেনে নিলেন। মা আর আমি বোকার মত শুধু অবাক বিস্ময়ে সইমা'র দিকে চেয়েছিলুম, একি পাগলের মত তিনি বলে যাচ্ছিলেন। মার দুর্ব্বল বক্ষঃ স্পন্দিত করে' ঘন ঘন নিশ্বাস পড়তে লাগ্‌ল। সইমা মায়ের বুকে খানিকটা মালিশ নিয়ে মালিশ করে' দিতে দিতে তেমনি সহজভাবে বলে' যেতে লাগ্‌লেন, "আমার ছেলের উপর বরাবরই বিশ্বাস আছে, সে কখনও যে আমার একটি কথা অমান্য করেনি। যেমন বল্‌লুম, 'ওরে আজিজ, তোর সই মা যে তোর শ্বাশুড়ী হবেরে, 'বেগম'কে আমার বৌ করে ঘরে আন্‌তে চাই, তোর বৌ পছন্দ হবেত আবার! আজ কাল ত বাবা তোরা মা বাপের পছন্দে বে' করিস্ না কিনা তাই'—আমাকে আর বেশী বল্‌তে হ'ল না, সে খুব খুসী হ'য়েই বল্লে, 'বেশত মাজান্, তোমার কথার ত আর কখনও অবাধ্য হইনি, আর তুমি যে আমায় কোন জমীদার বাড়ীতে বে' না দিয়ে একটি অনাথা গরীবের মেয়েকে উদ্ধার করতে যাচ্ছ, এতে আমার এত আনন্দ হচ্ছে যে দুনিয়ার লোককে জড় ক'রে দেখাই আমার মায়ের মত উঁচু মন আর কার আছে।' আজিজ আমার জনম-পাগলা

মা-নেওটা ছেলে কিনা, আর সে যে আবদার ধ'রেছে যখন, তখনই তাই পূর্ণ ক'রেছি কিনা, তাই ওর চোখে আমার মত মা নাকি আর বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে পাওয়া যায় না! সে যাক্ এখন বোন্, আমি আজই বেগমকে দোওয়া করে যাব, কেন না হায়াত মউত গালি না, কখন কি হয় বলা ত যায় না—তোর আবার এই রকম খাটে মাদুরে অবস্থা। আমি মনে করছি এই মাসের মধ্যেই ব্যাটাকে' বৌকে বরণ করে ঘরে তুলি, শুভকাজে বিলম্ব করা ভাল নয়, আর তাতে গ্রামের অনেকে অনর্থক কতগুলো বাধা বিপত্তি করবে, সই, মা বেগম আমার শূন্যপুরী পূর্ণ করুক যেয়ে!" সই মা আর কি বলেছিলেন ঠিক মনে নাই, কেননা আমার মাথা তখন বন্ বন্ করে ঘুরছিল, মস্তিষ্কের ভিতর কি একটা তীব্র উত্তেজনা ঘুরপাক খাচ্ছিল,—একটা হঠাৎ পাওয়া নিবিড়-বেদনাময় আনন্দের আঘাতে কে যেন আমার সমস্ত শরীরে নিশা করে' দিচ্ছিল।

(গ)

"খুব ধুমধামে আমাদের বে' হয়ে গেল। ধুমধাম মানে 'আতস-বাজি', 'বাজনা', 'বাইনাচ', 'থিয়েটার' প্রভৃতি যে সকল অসাধু কলুষ আনন্দের কথা বুঝ তোমরা, তার কিছুই হয়নি, আর যদি ধুমধাম মানে নির্দ্দোষ পবিত্র আনন্দের বিনিময় বুঝায়, তা হ'লে তার কোথাও এতটুকু ত্রুটি ছিল না। গ্রামের সমস্ত গরীব দুঃখীকে সাতদিন ধরে' সুন্দররূপে ভাল ভাল খাবার খাওয়ান হ'য়েছিল। অনেকের পুরাণো ঘর নূতন ক'রে ছেয়ে দেওয়া হ'য়েছিল। যা'দের হালের গরু না থাকায় সমস্ত জমি জমা পতিত হ'য়েছিল, তাদের গরু কিনে দেওয়া

হয়েছিল! গ্রামের তাঁতি দু' ঘরকে দুটী তাঁতের কল কিনে দিয়ে তাদের দেশী কাপড় বুনায় উৎসাহ দেওয়া হ'য়েছিল। কল্‌কাতার এতিমখানায় পাঁচ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল। সে সব আরও কত যায়গায় কত টাকা দিয়েছিলেন যে মা, তা আমার এখন সব মনে নেই।

"সই মা আমায় বধূ করে' যত খুসী হয়েছিলেন, তার চেয়ে অনেক বেশী দুঃখিত হয়েছিল গ্রামের লোকেরা, আর ওর আত্মীয় কুটুম্বেরা। ওঁদের অনেক আত্মীয় ছোট ঘরে বে' দেওয়ার জন্যে বে'র নিমন্ত্রণে একেবারেই আসেন নি। এমন কি এই নিয়ে অনেকের সঙ্গে চিরদিনের জন্যে ছাড়াছাড়ি হ'য়ে গেছিল। অনেক হিতৈষী মিত্রও শত্রু হয়ে দাঁড়াল। তবে পয়সার খাতির সব যায়গাতেই, তাই অনেক চতুর মাতব্বর লোক এঁদের সঙ্গে মৌখিক সদ্ভাব রেখে' ভিতরে ভিতরে অনিষ্ট করতে লাগ্‌ল। সমাজে পতিত না হলেও বিশেষ কাজ বনাম স্বার্থ ছাড়া আর কেউ এ বাড়ী আস্‌ত না। কিন্তু যেসব সহায়হীন গরীব বেচারারা জন্মাবধি এ বাড়ীর সাহায্যে প্রতিপালিত হ'য়ে এসেছে তা'রা সমাজের এ চোখ রাঙ্গানি দেখে' শুধু উপরে উপরে ভয় ক'রে চল্‌ত। তা'রা জান্‌ত, সমাজ শুধু চোখ রাঙাতেই জানে। যে যত দুর্ব্বল তা'র তত জোরে টুঁটি চেপে ধর্‌তেই সমাজ ওস্তাদ। যেখানে উল্টো সমাজকেই চোখ রাঙিয়ে চল্‌বার মত শক্তিসামর্থ্যওয়ালা লোক বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে সমাজ নিতান্ত শান্ত শিষ্টের মতই তা'র সকল অনাচার আব্‌দার বলে' সয়ে নিয়ে থাকে। তাই উনি আর ওর মা বল্‌লেন, "আমাদের সমাজই নাই ত সমাজচ্যুত করবে কে?"—সমাজ তবুও সুবোধ শিশুর মত কোন সাড়াই দিলে না, কিন্তু

ওঁদের বাড়ীতে যে সব গরীব বেচারারা আসৃত তাদের খুব কড়া ভাবেই শাসন করা হ'ল, যেন কেউ ওঁদের বাড়ীর ছায়াও না মাড়ায়।

"লোকের এরূপ ব্যবহারে আদৌ দুঃখিত না হ'য়ে ওঁরা বরং হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তাছাড়া গ্রামের দরিদ্রের সেই আনন্দোদ্ভাসিত মুখে, অশ্রু ছলছল চোখে যে একটা মধুর স্নিগ্ধ হাসি ফুটে উঠে'ছিল, তারই জ্যোতিঃ ওদের হৃদয় আলোয় আলোময় করে' দিয়েছিল; উল্টোদিকে পরশ্রীকাতর লোকদের চোখ মুখ ভয়ানক ভাবে ঝল্‌সে দিয়েছিল!

"ওঃ, সে কি অমানুষিক শক্তি ছেয়ে ফেলেছিল মায়ের ঐ ঝাঁজরা বুক আমার বিয়ের দিনে! মায়ের আনন্দের আকুল ধারা যেন কোথাও ধর্‌ছিল না সেদিন! হাজার কাজের ভিতর হাসির মাঝে অশ্রু উথ্‌লে পড়্‌ছিল তাঁর!

"আমার জীবন কিন্তু সার্থকতায় সমুজ্জল হ'য়ে উঠেছিল সেই দিন —যে দিন বুঝ্‌লুম আমার হৃদয়-দেবতাও তাঁর মাতৃদত্ত আশীর্ব্বাদ সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করে'ছেন, আমার প্রাণের গোপন পূজা আরাধ্য দেবতার পায়ের বৃথা নিবেদিত হয় নাই।

"আমার শুধু ইচ্ছা হ'ত আমি তাঁর পায়ে মাথা কুটি আর বলি, ওগো স্বামিন্! ওগো দেবতা! এত আনন্দ দিয়ো না এ ক্ষুধিতাকে প্রেমের এত আকাশ-ভাঙা ঘন বৃষ্টি ঢেলে' দিও না এ চিরমরুময় হৃদয়ে,—সকল মন দেহ প্রাণ ছেয়ে ফেলো না তোমার ও ব্যাকুল ভালবাসার ব্যগ্র নিবিড় আলিঙ্গনে! আমার ছোট্ট বুকে যে এত আনন্দ, এত ভালবাসা সইতে পারবে না,—কিন্তু হায়, তাঁর ও ভুজবন্ধনে ধরা দিয়ে আমার আর কিছুই থাকত না, আমি আমার বর্ত্তমান ভূত ভবিষ্যৎ ভুলে

যেতুম! এ যেন স্বপ্নে পরীস্থানে গিয়ে প্রিয়তমের অধীর বক্ষে মাথা রেখে সুপ্ত-বধির হ'য়ে যাওয়া, প্রাণের সকল স্পন্দন, দেহের সমস্ত রুধির অবাক স্তব্ধ হ'য়ে থেমে যাওয়া,—শুধু তুমি আর আমি—অনুভব করা, সে-কোন অসীম সিন্ধুতে বিন্দুর মত মিশে যাওয়া!

"তাঁর ঐ বিশ্বগ্রাসী ভালবাসা যখন চোখের কালোয় জ্যোতির মত হ'য়ে ফুটে' উঠ্‌ত, তখন শুধু ভাব্‌তুম প্রেমে মানুষ কত উচ্চ হ'তে পারে! এর এতটুকু ছোঁয়ায় সে কি কোমলতার সিগ্ধ পূত সুরধুনী ব'য়ে যায় সারা বিশ্বের অন্তরের অন্তর দিয়ে। দেবতা ব'লে কি কোন কথা আছে? কখ্‌খনো না, মানুষই যখন এই রকম উচ্চ হ'তে পারে, অতল ভালবাসায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তলিয়ে দিতে পারে, নিজের অস্তিত্ব ব'লে কোন কিছু একটা মনে থাকে না—সে দেখে, সব সুন্দর আর আনন্দ, তখনই মানুষ দেবতা হয়! দেবতা ব'লে কোন আলাদা জীব নাই।

* * * *

"যাক্ ওসব কথা এখন,—কি বল্‌ছিলুম?—হাঁ, আমার বিয়ের মত এত বড় একটা অস্বাভাবিক কাণ্ডে গ্রামময় মহা হুলুস্থুল প'ড়ে গেল। বংশে নিকৃষ্ট, সহায়সম্বলহীন আমাদের ঘরে সৈয়দবংশের বি, এ, পাশ করা সোনার চাঁদ ছেলের বিয়ে হওয়া ঠিক যেন রূপকথায় ঘুঁটে-কুড়োনির বেটীর সাথে বাদ্‌শাজাদার বিয়ের মতই ভয়ানক আশ্চর্য্য। ঠেকছিল সকলের চোখে! গ্রামের মেয়েরা অবাক বিস্ময়ে আমার দিকে চেয়েছিল,—'বাপ্‌রে বাপ, মেয়েটার কি পাঁচপুয়া কপাল!' তারা এও বল্‌তে কসুর করেনি' যে, আমি আবাগী নাকি রূপের ফাঁদ পেতে অমন নিষ্কলঙ্ক চাঁদকে বেমালুম কয়েদ করে' ফেলেছিলুম? এত

বলেও যখন তা'রা একটুও ক্লান্ত হ'ল না, তখন সবাই একবাক্যে ব'লে বেড়াতে লাগল যে, বুনিয়াদি খান্দানে এমন একটা খট্‌কা, এও কি কখন সয়? এত বাড়াবাড়ি সইবে না, সইবে না। কখন আমাদের কপাল পুড়ে আর তাদের দশ জনের ঐ মহাবাক্যটা দৈববাণীর মত ফলে' যায়, তাই আলোচনা করে' করে' তাদের আর পেটের ভাত হজম হত না, আমার কিন্তু তখন কিছুই শুন্‌বার আগ্রহ ছিল না,—যে-দেবতা এমন ক'রে তাঁর পরশমণির স্পর্শে আমার সকল ভুবন এমন সোনা ক'রে দিয়েছিলেন, যাঁর মাঝে আমার সকল সত্ত্বা, সব আকাঙ্ক্ষা চাওয়া পাওয়া একাকার হ'য়ে মিশে গিয়েছিল, আমি সব ভুলে গিযে শুধু সেই দেবতাকেই নিত্য নূতন করে' দেখছিলুম। তখন যে আমার ভাববার আর বলবার কিছুই ছিল না। তখন যে সব পেয়েছি'র আসরে আনন্দময় হ'যে যাবার মাহেন্দ্রক্ষণ! কিন্তু হায়, কালের অত্যাচারে সে মাহেন্দ্রক্ষণ আসবার আগেই এই সুন্দর বিশ্বের সে কি শক্ত দিকটা চোখে পড়ে গেল। প্রাণে বিরাট শান্তি নেমে আসবার আগেই সে কি গোলমাল হয়ে গেল সব। আগে হতেই আমার প্রাণের নিভৃততম দেশে সে কি এক আশঙ্কা যেন শিউরে শিউরে উঠ্‌ত। মনে হ'ত যেন এত সুখের পেছনে সে কি বজ্র ওত পেতে রয়েছে। কখন আমার এ আকাশ-কুসুম ভেঙ্গে যাবে! —মনে হ'ত এ ক্ষণিকের পাওয়া যেন একটি রজনীর স্বপ্নে পাওয়া ছোট্ট এক টুকরা আনন্দ, স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলেই তেমনি ঘুটঘুটে অন্ধকার!

"মা আমায় সম্প্রদান করেই আবার শয্যা আশ্রয় করে ছিলেন, তাঁর যে তখন আর চাইবার বা কর্‌বার কিছুই ছিল না, তখন যে মা মুক্ত! তাই তিনিও আমায় সইমার হাতে দিয়ে যে দেশের কেউ খবর

দিতে পারে না সেই কোন্ অজানার দেশে চলে' গেলেন, বোধ হয় সেখানে আমার বাবা খোকাখুকীদের নিয়ে অশ্রু-সজল নয়নে পথের দিকে চেয়েছিলেন। যাবার সময় সে কি তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠেছিল মা'র পাণ্ডুর ওষ্ঠপুটে! আমি যখন মা'র বুকে আছাড় খেয়ে কেঁদে উঠলুম, "মাগো যেয়েনা—আমার যে আর দুনিয়ায় কেউ নেই মা," তখন মা আমার মুখে হাত দিয়ে বলেছিলেন, "বলিস্‌নে বলিস্‌নে রে অমন কথা বেগম, তোর অভাব কিসের? এমন মায়ের চেয়েও স্নেহময়ী শাশুড়ী, দেবতার চেয়েও উচ্চ স্বামী, এত পেয়েও রাক্ষুসী বল্‌ছিস্ কিছুই নেই তোর? ছি মা, বলিস্‌নে অমন অপয়া কথা!"

"মাকে বাবার পাশেই গোর দেওয়া হল। আজ তাহেরার আর আবুলের কবর যেমন ধূলোর সঙ্গে মিশে গিয়েছে, দুদিন বাদে মারও কবর অমনি সমান হ'য়ে মিশে যাবে, আজ কিন্তু আমার বুকে পুঞ্জীভূত বেদনার এই যে একটা শক্ত গেরো বেঁধে গেল, সে কি মিশাবে কখনও?

"এর পর হ'তে এই সব উপর্য্যুপরি শোকের আঘাতে আমার মারাত্মক মূর্চ্ছারোগে ধরলে। প্রায় আমি অচেতন হয়ে পড়তুম, আর যখনই চেতন হ'ত তখনি দেখতুম আমার ধূলিধুসরিত শির রয়েছে তাঁর—আমার স্বামীর ঘন স্পন্দিত বিশাল বক্ষে,—তাঁর সব-ভুলানো ব্যাকুল বাহুবন্ধনের মাঝে! ওঃ, সে কি ভীত করুণাঘনদৃষ্টি তাঁর চোখে ফুটে উঠ্‌ত? সহানুভূতির সে কি কোমল স্নিগ্ধছায়া ছে'য়ে ফেলত তাঁর স্বভাব-সুন্দর মুখখানি! আমার তখন মনে হো'ত এর চেয়ে মেয়েদের কি আর সুখ থাকতে পারে! এর চেয়ে আকাঙ্খিত ইপ্সিত কী সে অপার্থিব জিনিষ চাইতে পারে আমাদের মন্দভাগিনী স্ত্রী জাতিরা?

হায় সে সময়ে স্বামীর কোলে অমনি করে মাথা রেখে কেন আমার শেষ নিশ্বাসটুকু বাতাসের সঙ্গে মিশে যায়নি ?

(ঘ)

"এখন বলছি বোন তোকে আমার কাহিনীটা এও যে একটা 'কেথ্সা'। কে আমার এ কথা বিশ্বাস কর্‌বে আর কেইবা শুন্‌বে ? তাঁর উপর নাকি আমার মগজ বিগড়ে, গিয়েছে আর তাই মাঝে মাঝে আমি খুব শক্ত বক্তিমা ঝেড়ে আমার বিদ্যা জাহির করি। আমার এই রকম বকর বকর করাটা কেউ পছন্দ করে না, তাই একটু শুনেই বিরক্ত হয়ে চ'লে যায়। আচ্ছা বোন্ বলত মেয়ে মানুষে আবার কবে কথা গুছিয়ে বলতে পেরেছে আর খুব বেশী বলাই মেয়েদের স্বভাব কিনা ! আমি কম্ কথায় কি করে আমার সকল কথা জানাব ? তাই হয়ত বলবি তোকে কে মাথার দিব্যি দিয়েছে তোর কথা বলবার জন্যে ? তাও বটে, তবে পেটের কথা, বুকের ব্যথা লোককে না জানালেও যে জানটা কেমন শুধু আনচান করে, বুকটা ভারি হয়ে ওঠে, এওত একটা মস্ত জইর 'গজব'।

* * * *

"সইমা এত বড় রাশভারি লোক ছিলেন যে সবাই তাঁকে ভয় ক'রে চল্‌ত, তিনিই ছিলেন ঘরের মালিক। কেউ তার কথায় 'টুঁ'টি করুতে পারত না। তাই এত বড় একটা অঘটন,—আমার মত পাতাকুড়ুনীর বেটীকে রাজবধূ করা সত্ত্বেও মুখ ফুটে' কেউ আর কিছু বলতে পারল না তেমন। মেয়েরা প্রকারান্তরে আমার নীচু ঘরের কথা জানতে এলে তিনি জোর গলায় বলতেন, "জাত নিয়ে কি ধুয়ে

খাব? আর জাত লোকের গায়ে লেখা থাকে? যার চালচলন শরিফের মত সেই ত' আশরাফ। খোদা কিয়ামতের দিনে কখ্‌খনো এমন বলবেন না যে তুমি সৈয়দ সাহেব, তোমার আবার পাপ পুণ্যি কি তোমার নিঘ্‌ঘাত বেহেশ্‌ত আর তুমি 'হালগজ্জা' শেখ, অতএব তোমার সব 'সওয়াব' (পুণ্য) বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে, কাজেই তোমার কপালে ত' জাহান্নাম ধরা বাঁধা! আমি চাই শুধু গুণ তা সে যে জাতই হোক না কেন। দেখুক ত এসে আমার বৌকে—ঘর আলো করা রূপ, আশ-রাফের চেয়েও আদব তমিজ, লেখাপড়া জানা, কাজকর্ম্মে পাকা এমন লক্ষ্মী বৌ আর কার আছে! আর কি জন্যই বা বড় ঘরের বেটীকে ঘরে আনব, সে যত না আনবে রূপ গুণ, তার চেয়ে বেশী আন্‌বে বাপ মায়ের গরব আর অশান্তি! আমার এই সোনার চাঁদ ছেলে বেঁচে থাক, ওর ঘরে ছেলেপিলে, দেখি, তা হলেই আমি হাসতে হাসতে মর্‌ব।" মায়ের সেই স্নেহভিজা কথায় যে কতই আনন্দে বুক ভরে উঠত! আমার চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে জল পড়ত। কৃতজ্ঞতা আর ভক্তির ভাষা বুঝি মর্ম্মের অশ্রু!

"স্বামীর সত্যিকারের ভালবাসা আর সইমার মেয়ের চেয়েও নিবিড় স্নেহ আমার ত আর কিছুই অপূর্ণ রাখেনি। দুনিয়াব যখন যা' দেখতুম, তাই সব যেন সুন্দর হয়ে ফুটে উঠ্‌ত। কই, ওর আগে ত এই মাটির দুনিয়াকে এত সুন্দর ক'রে দেখিনি'। ভালবাসার অঞ্জন কি মহিমা জানে, যাতে সব অসুন্দর অত সুন্দর হ'য়ে ফুটে' ওঠে।

"এত সুখ, তবুও পোড়া মন কেন আপনা আপনিই সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়্‌ত। পাড়াপড়শী লোকের ঐ একটা কথাই যেন শাখচিল্লির মত কানের কাছে এসে বাজ্‌ত, "সইবে না, সইবে না!" চোরের মন

বোঁচকার দিকে, তাই আমার মত হতভাগীর মনে যে শুধুই অমঙ্গলের বাঁশী বাজবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি?—ঐ অত গভীর ভালবাসার আঘাতেই যে আমাকে বিব্রত ক'রে তুলেছিল! মধু খুবই মিষ্টি, কিন্তু বেশী খাওয়ালেই গা জ্বালা করে। তাই আমার মনে হ'ত ওদের পায়ে মাথা কুটে বলি, "ওগো দেবতা, ওগো স্বর্গের দেবী, তোমরা এত স্নেহ এত ভালবাসা দিয়ে ছেয়ে ফেলোনা আমায়, আমি যে আর সইতে পার্‌ছি না! স্নেহের ঘায়ে যে আমার হৃদয় ভেঙ্গে পড়্‌ল! একটু ঘৃণা কর, খারাপ বল, আমায় খুব ব্যথা দাও, তা নৈলে আমার বক্ষ নুয়ে যাবে যে!" আর অমনি আবার সেই ভীষণ মূর্ত্তি চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠ্‌ত "সইবে না"

"এমনি করে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে দুটো বছর কোথায় দিয়ে যে কোথায় চলে গেল, তা জান্‌তে পারলুম না। এমন সময় ঐ যে প্রথমে বলে-ছিলুম, কলেরা আর বসন্ত জোট করে' রাক্ষসের মত হাঁ করে আমাদের গ্রামটা গ্রাস ক'রে ফেললে। তা'দের উদর যেন আর কিছুতেই পরতে চায় না। সে কি ভীষণ বুভুক্ষা নিয়ে এসেছিল তা'রা! সমস্ত গ্রামটা যেন গোরস্থানেরই মত খাঁ খাঁ করতে লাগল। গ্রামের সকল যে যেদিকে পার্‌লে মৃত্যুকে এড়িয়ে যেতে ছুট্‌ল। ভেড়ার দলে যখন নেকড়ে বাঘ প্রবেশ করে তখন সমস্ত ভেড়া একসঙ্গে জুটে চারিদিকে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে চক্ষু বুজে মাথা গুঁজে থাকে, মনে করে তাদের আর কেউ দেখ্‌তে পাচ্ছে না। কিন্তু মানুষ যাঁরা, তাঁরা ত আর মানুষকে এমন অবস্থায় ফেলে যেতে পারে না। তাঁদের একই রক্ত মাংসের শরীর, তবে ভিতরে কোন কিছু একটা বোধ হয় বড় জিনিষ থাকবে। সবারই সঙ্গে সমান দুঃখে দুঃখী, সবারই দুঃখ ক্লেশের ভাগ

নিজের ঘাড়ে খুব বেশী করে চাপানতেই ওদের আনন্দ। ঐ বুঝি তাদের মুক্তি।

"যখন সবাই চলে' গেল গ্রাম ছেড়ে', তখন গেলুম না কেবল আমরা, উনি বল্‌লেন "মৃত্যু, নাই, এরূপ দেশ কোথা, যে গিয়ে লুকুব?" সবাই যখন মহামারীর ভয়ে রাস্তায় চলা পর্য্যন্ত বন্ধ করে' দিলে' তখন কোমর বেঁধে উনি পথে বেরিয়ে পড়লেন, বল্‌লেন, "এই ত আমার কাজ, আমায় ডাক দিয়েছে!" সে কি হাসিমুখে আর্ত্তের সেবার ভার নিলেন তিনি। তখন তিনি এম, এ, পাশ করে' আইন পড়ছিলেন। কলকাতায় খুব গরম পড়াতে দেশে এসেছিলেন। কি গরীয়সী শক্তির শ্রী ফুটে' উঠেছিল তাঁর প্রতিভা-উজ্জ্বল মুখে সেদিন।

"আবার সেই বাণী, "সইবে না, সইবে না!"

"দিন নেই, রাত নেই, খাওয়া নেই, দাওয়া নেই, আর্ত্তের চেয়েও অধীর হ'য়ে তিনি ছুটে' বেড়াতে লাগলেন কলেরা আর বসন্ত রোগী নিয়ে। আমি পায়ে ধরে বল্‌লুম, ওগো দেবতা! থাম, থাম, তুমি অনেকের হ'তে পার, কিন্তু আমার যে, আর কেউ নেই। ওগো আমার অবলম্বন থাম, থাম। হায়, যাঁকে চলায় পেয়েছে তাঁকে আর থামায় কে? বিশ্বের কল্যাণের জন্য ছুটছিল তাঁর প্রাণ! তাঁর সে দুনিয়া ভরা বিছানো প্রাণে আমার এ ক্ষুদ্র প্রাণের কান্নার স্পন্দন ধ্বনিত হ'ত কি? যদি হ'ত তবে সে শুধু ছুঁয়ে যে'ত নুয়ে যেত না।

"যে অমঙ্গলের একটু আভাব আমার অন্তরের নিভৃততম কোণে লুকিয়ে থেকে আমার সারা বক্ষ শঙ্কাকুল ক'রে তুলেছিল, সেই ছোট্ট ছায়া যেন সেদিন কায়া হ'য়ে আমার চোখের সামনে বিকট মূর্ত্তিতে এসে' দাঁড়া'ল। সে কি বিশ্রী চেহারা তার!

"মা কখন ওর কাজে বাধা দেন নি'। শুধু একদিন সাঁজের নামাজ শেষে অশ্রু ছলছল চোখে তাঁর শ্রেষ্ঠধন একমাত্র পুত্রকে খোদার "রাহায়" উৎসর্গ ক'রে গিয়েছিলেন। ওঃ, ত্যাগের মহিমায়, বিজয়ের ভাস্বর-জ্যোতিতে কি আলোময় হ'য়ে উঠেছিল তাঁর সেই অশ্রুস্নাত মুখ সেদিন! মনে হ'ল যেন শতধারায় খোদার আশীষ অযুত পাগলা ঝোরার বেগে মায়ের শিরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমারও বক্ষ একটা মূঢ় বেদনা-মাখা গৌরবে যেন উথ্‌লে পড়ছিল।

"এই রকম লোককেই দেবতা বলে,—না?

(ঙ)

"সে দিন সকাল হ'তেই আমার ডান চোখটা নাচতে লাগল, বাড়ীর পিছনে অশ্বত্থ গাছটায় একটা প্যাচা দিন দুপুরেই তিন তিন বার ডেকে উঠল, মাথার উপর একটা কালো টিক্‌টিকি অনবরত টিক্ টিক্ করে' আমার মনটাকে আরও অস্থির চঞ্চল করে' তুল্‌ছিল। আমার অদৃষ্টের সঙ্গে ওদের কি সংযোগ ছিল?

"উনি সেই যে ভোরে বেরিয়ে গিয়েছিলেন একটা লাশ কাঁধে করে নিয়ে, সারাদিন আর ফেরেন নি। আমি কেবল ঘর আর বা'র করেছিলুম।

"বিকাল বেলায় খুব ঘনঘটা ক'রে মেঘ এল, সঙ্গে সঙ্গে তুমুল ঝড় আর বৃষ্টি। সে যেন মস্ত দুটো শক্তির দ্বন্দ্বযুদ্ধ! ওঃ এত জল আর পাথরও ছিল সেদিনকার মেঘে! সামনে বিশ হাত দূরে বজ্র পড়ার মত কি একটা মস্ত কঠোর আওয়াজ শুনে আমার মাথা ঘু'রে গেল, আমি অচেতন্ হ'য়ে পড়ে' গেলুম।

*　　*　　*　　*

“যখন চেতন হ’ল, তখন বাড়ীময় একটা ঝড় ব’য়ে যাচ্ছে, চারিদিকে হাহাকার, আর জল পড়ার ঝম্ ঝম্ শব্দ। একটা মস্ত বড় বজ্র ঠিক আমার কপাল লক্ষ্য করে ছুটে আস্‌ছে!

“আমার স্বামী দেবতা তখন বিছানায় শুয়ে ছট্‌ফট্ কর্‌ছেন, আর মা পাষাণ-প্রতিমার মত তাঁর দিকে শুধু চেয়ে র’য়েচেন। চোখে এক ফোঁটা অশ্রু নেই, যেন হৃদয়ের সমস্ত অশ্রু জমাট বেঁধে গেছে। দৃষ্টিতে কি এক যেন অতীন্দ্রিয় ঔজ্জ্বল্য। সে কি বিরাট নির্ভয়তা।

“শুনলুম সে দিন আমাদের পাশের গাঁয়ের দশ বার জন কলেরা রোগীকে গোর দিয়ে কয়েক জনকে ঔষধ পথ্য দিয়ে উনি বাড়ী ফির্‌ছিলেন। পথে তাঁকে ঐ রোগে আক্রমণ কর্‌লে। একটা পুবাণো বটগাছের তলায় তিনি অজ্ঞান হ’য়ে প’ড়েছিলেন, একটু আগে উঠিয়ে আনা হয়েছে।—আবার বৃষ্টি এল, সমস্ত আকাশ ভেঙ্গে ঝম্ ঝম্ ঝম্!…

“তাঁকে ধ’রে রাখবার ক্ষমতা আর কারুর ছিল না।—তাঁ’র কাজ শেষ হ’য়ে গেছিল, আর থাকবেন কেন? তিনি চলে’ গেলেন! যার যতটা ইচ্ছা গেল কাঁদলে। আমাদের ঘরের আঙিনার নিমগাছটার পাতা ঝ’রে পড়্‌ল, ঝর্ ঝর্ ঝর্! গোয়ালের গরু দড়ি ছিঁড়ে গোঁঙাতে গোঁঙাতে ছুটল। দ্বারে কাকাতুয়াটি শুধু একবার একটা বিকট চীৎকার করে অসাড় হ’য়ে নীচের দিকে মুখ ক’রে ঝুলে পড়ল। চারিদিকে মুমূর্ষুর ক্ষীত একটা আহা আহা শব্দ রহিয়ে রহিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। ‘সব ব্যেপে’ উঠ্‌তে লাগল শুধু একটা বীভৎস কান্নার রব! কান্নায় যেন সারা বিশ্বের বত্রিশ নাড়ী পাক দিয়ে অশ্রু ঝর্‌ছিল, ঝম্ ঝম্ ঝম্।

"শুধু তেমনি অচল অটল হ'য়ে একটা বিরাট পাহাড়ের মত দাঁড়িয়েছিলেন মা !

"শুধু তাঁর শেষ সময় বলেছিলেন, "বাপ্‌রে, আমাকে ত' কাঁদতে নেই' তুই ত আর আমার নস্', তোকে খোদার কাছে কোরবাণী দিয়েছি ! খোদার নামে উৎসর্গীকৃত জিনিষে ত আমার অধিকার নেই !—তবে চল্ বাপ, তুই ত আমায় ছেড়ে এক মুহূর্ত্তও থাক্‌তে পারিস্ নি, আমিও তোকে কখনও চোখের আড়াল করিনি'। তোর কাজ ফুরিয়েছে, আমারও কাজ ফুরাল আজ।"

"কতকগুলো লোকের মগজ নাকি এম্‌নি খারাপ হ'য়ে যায় যে, তারা এক একটা ছোট্ট মুহূর্ত্তকেই একটা অখণ্ড কাল বলে ভাবে, তবে কি আমারও মাথা সেই রকম খারাপ হ'য়ে গেছে, তা না হ'লে আমার বোধ হচ্ছে কেন, যে এসব ঘটনা যেন বাবা আদমের কালে ঘটে' গেছে, আর আমি এম্‌নি ক'রে গোরস্থানে বসেই আছি। তুই কিন্তু বল্‌ছিস, এই সে দিন তাঁরা মারা গেছেন ! তবে ত আমি সত্যিই পাগল হ'য়ে গেছি !

"কি বল্‌ছিস, এ গোরস্থানে এলুম কেন ?—আহা কথার ছিরি দেখ ! এই গোরস্থানে যেখানে সব সত্যিকার মানুষ শু'য়ে র'য়েছেন, সেখানে না এসে, যা'ব কি তবে বন জঙ্গলে যেখানে এক রকম জন্তু আছে, যা'দের শুধু মানুষের মত হাত পা' আর অন্তরটা শয়তানের চেয়েও কুৎসিত কালো ?—আমার বেশ মনে পড়ে, যখন তাঁ'র লাশ কাঁধে করে বাইরে আনা হ'ল, তখন ওদের কে একজন আত্মীয় আমার চুল ধরে' বল্‌লে, যা শয়তানী, বেরো ঘর থেকে এখনি ! তখনি বলেছিলুম, বুনিয়াদী খানদানের উপর নাগ চড়ান, এ

সইবে কেন? তোকে ঘরে এনে শেষে বংশে বাতি দিতে পর্য্যন্ত রইল না কেউ; বেরো রাক্ষুসী, আর গাঁয়ের লোকের সামনে মুখ দেখাস্ না! আর ইচ্ছা হয় চল্, তোর আর একটা নেকা দিয়ে দি!”—অত মার গা'ল কিছুই বাজে নাই আমার প্রাণে, যত বেজেছিল ঐ একটা নেকার কথায়। ঐ বিশ্রী কথাটা একটা মস্ত আঘাতের মত বেজেছিল আমার চূর্ণ বক্ষে।—ওগো নেকা কি? সে কি দুবার অন্যের গলায় মালা দেওয়া? শাস্ত্রে নেকার কথা আছে, সে কাদের জন্যে? আচ্ছা ভাই, যারা বাধ্য হ'য়ে অন্নবস্ত্রাভাবে বা আকাঙ্খার বশবর্ত্তী হ'য়ে ওরকম করে ভালবাসার অপমান করে' তাদের কি হৃদয় ব'লে কোন একটা জিনিষ নাই? তা হ'লেও তাদের ক্ষমা করা যেতে পারে, কিন্তু যারা শুধু কামনার বশবর্ত্তী হ'য়ে পবিত্রতাকে, নারীত্বকে ওরকম মাড়িয়ে চলে' যায় তাদের কোথাও ক্ষমা নাই। ভালবাসা—স্বর্গের এমন পবিত্র ফুলকে কামনার শ্বাসে যে কলঙ্কিত করে' তার উপযুক্ত বোধ হয় এখনও কোন নরকের সৃষ্টি হয় নাই।

“মৌলবী সাহেবরা হয়ত খুব চটে আমার ‘জানাজা'র নামাজই পড়বেন না, কিন্তু মানুষ আর মৌলবীতে অনেক তফাৎ—শাস্ত্র আর হৃদয় অনেকটা তফাৎ।

(চ)

“যেখানে শুধু এই রকম অবমাননা, সেখান থেকে সরে এসে এই মরার দেশে থাকাই ভাল।

*　　*　　*　　*

"ওকি তুমি এমন ক'রে আঁতকে উঠ্‌লে কেন? আমি মূর্চ্ছা গেছলুম বলে?—কি বল্‌চ, আমি বিষ খেয়েছি? তা হ'লে তুমিও পাগল হয়েছ! আমার চেহারা এমন নীল হ'য়ে গেছে দেখে তুমি হয়ত মনে করেছ আমি বিষ খেয়েছি। না গো না, আমি পাগল হই আর যাই হই ওরকম দুর্ব্বলতা আমার মধ্যে নেই। কেরাসিনে পোড়া, জলে ডোবা, গলায় দড়ি দেওয়া, বিষ খাওয়া মেয়েদের জাতটার যেন রোগের মধ্যে দাঁড়িয়েছে! আমার কপাল পুড়্‌লেও আমি ওরকম 'হারামি মওয়াত'কে প্রাণ থেকে ঘৃণা করি। এ মরায় যে এ-দুনিয়া ও আখের উভয়ের খারাবি বোন!

"কাল রাত্রে ভয় পেয়ে যখন তুই আমার কাছ হ'তে চলে গেলি, তার একটু পর থেকেই আমার ভেদবমি আরম্ভ হয়েছে। এই একটু আগে আমার জ্ঞান হ'ল।

"আমি বুঝতে পেরেছি বোন, আমার আর সময় নাই। আর কারুর চোখের জলের বাধা আমায় বেঁধে রাখতে পার্‌বে না। ওঃ এত দিনে ঐ নদী পারের অলস-ঘুমে ভরা সুরটা আমার প্রাণে গভীর স্পর্শ করে গেল। সে কত গভীর দুঃখ-ভরা! পানি আমার চোখের কোল ছেয়ে ফেলেছে দিদি। তার কোমল স্পর্শ আমার চোখের পাতায় পাতায় অনুভব কর্‌ছি। কি শিহরণ আমার প্রতি লোমকূপে খেলে বেড়াচ্ছে!

"কি পিপাসা, কি বুক ফাটা তৃষ্ণা! একটু পানি দেত বোন!—না না, আর চাই না। ঐ দেখ্‌তে পাচ্ছ "শরাবান্‌ তহুরা" ভরা পেয়ালা হাতে আমার স্বামী হৃদয়-সর্ব্বস্ব দাঁড়িয়ে র'য়েছেন! কি সহানুভূতি-আর্দ্র করুণ স্নেহময় গভীরদৃষ্টি তাঁর! আঃ! মাগো! আঃ!"

দুরন্ত পথিক

দুরন্ত পথিক

(কথিকা)

সে চলিতেছিল দুর্গম কাঁটা-ভরা পথ দিয়ে। চলিতে চলিতে সে একবার পিছন ফিরিয়া দেখিল, লক্ষ আঁখি অনিমেষে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। সে দৃষ্টিতে আশা উন্মাদনার ভাস্বর জ্যোতিঃ ঠিকরাইয়া পড়িতেছিল। তাহাই ঐ দুরন্ত পথিকের বক্ষ এক মাদকতা-ভরা গৌরবে ভরপূর করিয়া দিল। সে প্রাণ-ভরা তৃপ্তির হাসি হাসিয়া বলিল, "হা ভাই! তোমাদের এমন শক্তি-ভরা দৃষ্টি পেলে কোথায়?" অযুত আঁখির অযুত দীপ্ত চাউনি বলিয়া উঠিল,—"ওগো সাহসী পথিক, এ দৃষ্টি পেয়েছি তোমারই চলার পথ চেয়ে!" উহারই মধ্যে কাহার—স্নেহ-করুণ চাউনি বাণীতে ফুটিয়া উঠিল,—"হায় এ দুর্গম পথে তরুণ পথিকের মৃত্যু যে অনিবার্য্য।" অমনি লক্ষ কণ্ঠের আর্ত্ত ঝঙ্কার গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "চোপরাও ভীরু! এইত মানবত্মার সত্য শাশ্বত পথ!" পথিক দুচোখ পুরিয়া এই কল্যাণ-দৃষ্টির শক্তি হরণ করিয়া লইল তাহার সুপ্ত যত কিছু অন্তরের সত্য, এক অঙ্গুলি-পরশে সাধা বীণার ঝঞ্চনার মত সাগ্রহে সাড়া দিয়া উঠিল, —"আগে চল!" বনের সবুজ তাহার অবুঝ তারুণ্য দিয়া পথিকের প্রাণ ভরিয়া দিয়া বলিল—"এই তোমার যৌবনের রাজটীকা পরিয়ে দিলাম; তুমি চির-যৌবন, চির অমর হ'লে।" দূরের আকাশ আনত হইয়া তাহার শিরশ্চুম্বন করিয়া গেল। দূরের দিগ্বলয় তাহাকে মুক্তির সীমারেখার আবছায়া দেখাইতে লাগিল। দুই পাশে তাহার বনের শাখী শাখার পতাকা দুলাইয়া তাহাকে

অভিনন্দন করিতে লাগিল। স্বাধীন দেশের তোরণ দ্বার পারাইয়া বোধন-বাঁশী অগ্নি-সুর হরিণের মত তাহাকে মুগ্ধ মাতাল করিয়া ডাক দিতেছিল। বাঁশীর টানে মুক্তির পথ লক্ষ্য করিয়া সে ছুটিতে লাগিল। "ওগো কোথায় তোমায় সিংহদ্বার? দ্বার খোলো, দ্বার খোলো, —আলো দেখাও, পথ দেখাও!"···বিশ্বের কল্যাণের মন্ত্র তাহাকে ঘিরিয়া বলিল,—"এখনও অনেক দেরী, পথ চল!" পথিক চমকিয়া উঠিয়া বলিল,—"ওগো আমি যে তোমাকেই চাই!" সে অচিন সাথী বলিয়া উঠিল, —"আমাকে পেতে হ'লে ঐ সামনের বুলন্দ-দরওয়াজা পার হ'তে হয়!" দুরন্ত পথিক তাহার চলায় দুর্ব্বার বেগের গতি আনিয়া বলিল'—"হাঁ ভাই, তাহাই আমার লক্ষ্য!" দূরের বনের ফাঁকে মুক্ত গগন একবার চমকাইয়া গেল, পেছন হইতে নিযুক্ত তরুণ কণ্ঠের বিপুল বাণী শোর করিয়া বলিয়া উঠিল,—"আমাদেরও লক্ষ্য ঐ, চল ভাই আগে চল,—তোমারই পায়ে চলা পথ ধ'রে আমরা চলেছি" পথিক আগে চলার গৌরবের তৃপ্তি তাহার কণ্ঠে ফুটাইয়া হাঁকিয়া উঠিল, "এ পথে যে মরণের ভয় আছে।" বিক্ষুব্ধ তরুণ কণ্ঠে প্রদীপ্ত আগুন যেন গর্জ্জিয়া উঠিল,···"কুছ পর্‌ওয়া নেই! ও ত মরণ নয় ওযে জীবনের আরম্ভ!···" অনেক পিছনে পাঁজর-ভাঙ্গা বৃদ্ধেরা মরণের ভয়ে কাঁপিয়া মরিতেছিল! তাহাদের স্কন্ধদেশে চড়িয়া একজন মুখ চোখ ভ্যাঙ্গচাইয়া বলিতেছিল, —"এই দেখ মরণ!" একটু দূরে চন্দন-কুণ্ডলী ধোঁওয়া ভরা আগুন জ্বালাইয়া বৃদ্ধের দৃষ্টি-চাহনী প্রতারিত করার চেষ্টা হইতেছিল! হাসি চাপিতে চাপিতে একজন ইহাদিগকে সম্মুখের ধূলায় আগুনের দিকে খেদাইয়া লইয়া যাইতে যাইতে বলিতেছিল,—"ঐ ত সামনে তোমাদের নির্ব্বাণ কুণ্ড; এ বৃদ্ধ বয়সে কেন বন্ধুর পথে ছুটতে গিয়ে প্রাণ হারাবে?

ও দুরন্ত পথিকদল ম'ল বলে!" বৃদ্ধের দল দুই হাত উপরে উঠাইয়া বলিল,—হাঁ হুজুর আলবৎ!" তাহার আশে পাশে কাহার দুষ্ট কণ্ঠ বারে-বারে সতর্ক করিতেছিল,—"ওহো বেকুবদল, ভিক্ষায়াং নৈব চ নৈব চ! তোদের এরা নির্ব্বাণ-কুণ্ডে পুড়িয়ে তিল তিল করে মারবে!" তাদের রাখাল হাসি চাপিয়া বলিয়া উঠিল,—"না না, ওদের কথা শুনো না। ওদের পথ ভীতি-সঙ্কুল আর অনেক দূর, তাও আবার দুঃখ-কষ্ট-কাঁটা-পাথর-ভরা তোমাদের মুক্তি ঐ সাম্‌নে।"

দুরন্ত পথিক চলিয়াছিল, সেই মুক্ত দেশের উদ্বোধন বাঁশীর সুর ধরিয়া।...এইবার তাহার পথের বিভীষিকা জুলুম আরম্ভ করিল। পথিক দেখিল ঐ পথ বাহিয়া যাওয়ায় এক-আধটুকু অস্ফুট পদচিহ্ন এখনও যেন জাগিয়া রহিয়াছে। পথের বিভিষিকা তাহাদেরই মাথার খুলি এই নূতন পথিকের সাম্‌নে ধরিয়া বলিল,—"এই দেখ এদের পরিণাম।" সেই খুলি মাথায় করিয়া নূতন পথিক আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল,—"আহা এরাই ত আমায় ডাক দিয়েছে! আমি এমনই পরিণাম চাই—আমার মৃত্যুতেই ত আমার শেষ নয়, আমার পশ্চাতে ঐ যে তরুণ যাত্রীর দল, ওদের মাঝখানেই আমি বেঁচে থাক্‌ব।" বিভীষিকা বল্‌লে—"তুমি কে?" পথিক হেসে ব'ললে,—"আমি চিরন্তন মুক্তি-কামী। এই যাদের খুলি প'ড়ে রয়েছে তার কেউ মরেনি, আমার মাঝেই তারা নূতন শক্তি, নূতন জীবন নূতন আলোক নিয়ে এসেছে। এ মুক্তের দল অমর।" বিভীষিকা কাঁপিয়া উঠিয়া বলিল,—আমায় চেন না? আমি শৃঙ্খল। তুমি যাই বল, তোমাকে হত্যা করাই আমার ব্রত, মুক্তিকে বন্ধন দেওয়াই আমার লক্ষ্য। তোমাকে মর্‌তে হ'বে।" দুরন্ত পথিক দাঁড়াইয়া বলিল,—"মারো,—বাঁধো,—কিন্তু

আমাকে বাঁধতে পারবে না , আমার ত মৃত্যু নাই । আমি আবার আস্‌বো ।” বিভীষিকা পথ আগুলিয়া বলিল,—“আমাব যতক্ষণ শক্তি আছে, ততক্ষণ তুমি যতবারই আসো তোমাকে বধ কর্‌বো। শক্তি থাকে আমায় মারো, নতুবা আমার মার সহ্য কর্‌তে হবে।”

অনেক দূরে মুক্ত দেশের অলিন্দে এই পথেরই বিগত সঙ্গেদেরা চির তরুণ জ্যোতির্ম্ময় দেহ লইয়া দাঁড়াইযা তাহাকে আহ্বান করিতে লাগিল ! পথিক বলিল,—কিন্তু এই জীবন দেওযটাই কি জীবনেব সার্থকতা ?” মুক্ত বাতায়ন হইতে মুক্ত আত্মা স্নিগ্ধ-আর্দ্র কণ্ঠে কহিযা উঠিল,—“হাঁ ভাই ! যুগ যুগ জীবন ত এই মৃত্যুরই বন্দনা গান গাইছে। সহস্র প্রাণেব উদ্বোধনইত তোমাব মবণেব সার্থকথা। নিজে মরিয়া জাগানোতেই তোমাব মৃত্যু যে চিবজাগ্রত অমর।” নবীন পথিক তাহার তরুণ বিশাল বক্ষ উন্মোচন করিযা অগ্রে বাড়াইযা দিযা কহিল, —“তবে চালাও খঞ্জর !” পিছন হইতে তরুণ যাত্রীব দল ডুবন্ত পথিকেব প্রাণশূন্য দেহ মাথায় তুলিয়া লইয়া কাঁদিযা উঠিল—“তুমি আবাব এসো।” অনেক দূবে দিগ্বলয়ের কোলে কাহাদের একতান-সঙ্গীত ধ্বনিয়া উঠিতে লাগিল,—

“দেশ দেশ নন্দিত করি’ মন্দ্রিত তব ভেরী
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি !”

সম্পূর্ণ